দ্বিতীয় ভাগ। জানুয়ারি, ১৮৮৪। ১ম সংখ্যা।

দ্বিতীয় বর্ষ।

আমাদের 'সখা' আজ এক বছর কাটাইয়া দুবছরে পা দিতেছে, যাঁরা 'সখা'র সুখে সুখী, তাঁরা আজ এই সুখের দিনে আনন্দ কর। জন্মতিথিতে মানুষ কত আমোদ করিয়া থাকে, বন্ধুরা কত জিনিশ দেয়, মা বাপ কত খুসী হন, তবে আজ 'সখা'র জন্মদিনে কেন আনন্দ করিব না? 'সখা' গরিবের ছেলে, বালক বালিকাদিগের উপকার করিবার জন্য পৃথিবীতে আসিয়াছে, কিন্তু সে এখনও যে গরিব সেই গরিবই আছে। তাই বলিয়া তার জন্মদিনে কি কোন আমোদ হবে না? আমরা কোন বড় লোককে 'সখা'র জন্মতিথিতে আনন্দ করিতে বলিতেছি না। যে সকল বালকবালিকা 'সখা'কে আপনার জন বলিয়া মনে করেন, 'সখা'র সঙ্গে যাঁদের কিছু সম্পর্ক আছে তাঁহাদিগকেই এই জন্মতিথির নিমন্ত্রণে ডাকিতেছি।

এসো! 'সখা'র পাঠকপাঠিকাগণ, 'সখা'র জন্মদিনে আনন্দ করি; তোমাদেরি কাজ করিবার জন্য 'সখা'র জন্ম হইয়াছে, সে চিরকাল তোমাদেরি সখা। কিন্তু গরিব বলিয়া 'সখা' অনেকের কাছে ভালবাসা পাইল না। 'সখা'র পোসাক ভাল ন বলিয়া কোন কোন বড় লোক 'সখা'কে গাঁল. গালি দিয়াছেন; কিন্তু গরিব 'সখা' সাহেবদে মত পোষাক কোথায় পাইবে, তাহা কেউ বুে না। গালি খাইয়া 'সখা' যখন ছল্ ছল্ চক্ষে, মলিন মুখে চারিদিকে তাকাইতেছিল, তখন বাল বালিকাগণই তাহাকে স্থান দিয়াছেন। "এ ভাই, এসো! তুমি গরিব হইলেও আমাদের চিরকাল্ কিছু এ কষ্ট তোমার থাকিবে ন এই বলিয়া অনেক বালকবালিকা গরিব ' যত্ন করিয়া ঘরে ডাকিয়া লইয়াছেন, 'সখ দেরই যত্নে ঈশ্বরের দয়াতে বাঁচিয়া ব আজ দ্বিতীয় বৎসরে পা দিবার সময় 'স তাকাইয়া আগেকার কষ্টের কথা ম নিশ্বাস ছাড়িতেছে, এবং সুমুখে অবস্থা দেখিয়া, হাসিতে হাসিতে সেই সকল ব বালিকাকে ধন্যবাদ দিতেছে, কারণ তাঁহা অসময়ে সখাকে বন্ধু বলিয়া ঘরে লইয়াছিলেন

'সখা'র লেখক এবং লেখিকাগণকে ধন্য দেওয়া আমাদের দ্বিতীয় কাজ। তাঁহারা বি যত্ন করিয়া 'সখা'র জন্য উপযুক্ত প্রবন্ধ স লিখিয়াছেন, অথচ তাঁহাদের এই পরিশ্রমের মাত্র পুরস্কার লন নাই, এজন্য যে সখা-সম্প তাঁহাদের নিকট অত্যন্ত উপকৃত, তাহা কি বলিতে হইবে?

আর অধিক বলিবার নাই। 'সখা'র সম্মুখে আর এক বৎসর উপস্থিত হইল। জগদীশ্বর করুন, যেন এই নূতন বৎসরে আমাদের লেখক লেখিকাগণ 'সখা'র পাঠকপাঠিকাদিগের উপকারের জন্য পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক মনের সহিত লাগিয়া যান।

সহজে কি বড় লোক হওয়া যায়?

প্রথম অধ্যায়।

লেবেলা একটু একটু এক গুঁয়েমো প্রায় সকলেরই থাকে। আমার কথা শুনিয়া কেহ চটিবেন না। চটিলেও বড় একটা অসুবিধা বোধ করিবনা। অনেকের অভ্যাস আছে তাহারা খাঁটি কথা শুনিলে বিরক্ত হয়, কিন্তু কাহাকেও বিরক্ত করা আমার উদ্দেশ্য নহে। আমার নিজের দশা দেখিয়াই আমি পরের কথা শুনিতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি।

ছেলে মানুষদের একটা রোগ আছে। অনেক সময় তাহারা আপনা আপনি করিয়া অন্যলোককে করে, আবার যদি কেহ সেই কাজ তাহা- করিতে বলিল অমনি সেই কাজের মিষ্টত্ব দের নিকট হইতে চলিয়া যায়। দাদা বই পড়িতে শিখিয়াছে; তার ব'যে ছবি। পড়িবার সময় দাদা বই খুঁজিয়া না। আমার চোখে পড়িলেই আমি বই খানা করিয়া কেহ খুঁজিয়া না পায় এমন কোন গায় যাইয়া বসিতাম। শেষে একদিন শুনিলাম বই খানা আমারও পড়িতে হইবে, আমার আনন্দের সীমা রহিল না; তখনই দৌড়িয়া যাইয়া সঙ্গী- সকলকে খবরটা দিয়া আসিলাম। পরদিন র আসিলেই বই হাতে করিয়া হাজির। মনে লাম, প্রথম ছবিটার কথা আজ পূড়া হবে। মাষ্টার প্রথম ছবির পাতে একটু আসিলেন ও না,— ছবিশূন্য একটা পাত উল্টাইয়া এ, বি, সি, ডি, করিয়া কি বলিতে লাগিলেন! তখন হইতে আর সে বই আমার ভাল লাগিল না।

দাদা ইস্কুলে যাইবার সময় মাঝে মাঝে আমাকে সঙ্গে করিয়া নিয়া যাইত। দাদাদের মাষ্টার বড় ভাল মানুষ। আমি মনে করিলাম ইস্কুলের সকল মাষ্টারই বুঝি ঐরূপ। বাড়ীতে তিন বছর থাকিয়া কয়েক খানা বই শেষ করিলাম। তারপর আমাকেও স্কুলে পাঠাইয়া দিল। কয়েক বছর বেশ চলিতে লাগিলাম, কিন্তু মাষ্টারকে আর তত ভাল লাগে না। কবে বড় মানুষ হইয়া ইস্কুল ছাড়িয়া দিব এই চিন্তাটা বড় বেশী মনে হইত। তখন তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ি। ইংরাজি যে কয়েকখানা বই পড়িয়াছিলাম, তাহার একখানাতে এক সাহেবের কথা লেখা ছিল। তিনি বাড়ী ছাড়িয়া বিদেশে গিয়াছিলেন, সেখানে অনেক কষ্ট ভোগ করিয়া শেষটা অনেক টাকা করিয়াছিলেন। সাহেব যে বয়সে বাড়ী ছাড়িয়াছিলেন, মিলাইয়া দেখিলাম আমারও এখন ঠিক্ সেই বয়স। তবে আর চাই কি? ক্লাশে সতীশের সঙ্গে আমার বড় ভাব;—আমি সতীশের কাছে মনের কথাগুলি খুলিয়া বলিয়া ফেলিলাম! কথা শুনিয়া সতীশ যেন আর তার ছোট শরীরটীর মধ্যে আঁটে না। তখনই লাফা ইয়া উঠিল। বোধ হইল বাড়ী হইতে বিদেশে চলিয়া গেলেই বড় লোক হওয়া যাইবে; সতীশ বলিল "কালই চল"। কাল চলাট তত সহজ বোধ হইল না। কিন্তু বেশী দেরী করা হবে না সেটা ঠিক করা হইল।

একদিন ইস্কুল হইতে ছুটী লইয়া বাড়ী আসিলাম; সতীশও আসিল। বাবা বাড়ী ছিলেন না। বাড়ীর অন্যান্য লোকও চুপ করিয়া বিশ্রাম করিতেছিল। চুপি চুপি কয়েকখানা কাপড় দিয়া একটী পুটলী বাঁধিলাম। তার পর বাবা বাক্স

হইতে কতকগুলি টাকা লইয়া দুজনে চোরের মত বাড়ীর বাহির হইলাম। পাছে কেহ আসিয়া ধরে সেই ভয়ে দুজনে মাঝে মাঝে দৌড়িতে লাগিলাম। এইরূপে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত হাঁটিয়া এক বাড়ীতে যাইয়া উঠিলাম। ক্রমশঃ

শিশু স্বাস্থ্য রক্ষা।

সপ্তম উপদেশ—দ্বিতীয় পাঠ।

শরীরের মধ্যে যে রক্ত থাকে, তাহার মধ্যে জলের ভাগ অধিক। সেই জলের অভাব হইলেই আমরা পিপাসার্ত্ত হই। এই জন্য যতক্ষণ আমরা ক্ষয়িত জলের সমান পরিমাণ জল গ্রহণ না করি, ততক্ষণ আমাদের পিপাসা নিবৃত্তি হয় না। স্নান-সময়ে লোমকূপ দ্বারা শরীর মধ্যে জল প্রবেশ করে, এজন্য স্নান দ্বারা অনেক সময়ে পিপাসা নিবৃত্তি হইয়া থাকে। জল পান দ্বারাই অবশিষ্ট জলের অভাব পূর্ণ হয়। অতএব জল অতিশয় প্রয়োজনীয় পদার্থ। নিয়মিতরূপে জল পান করা কর্ত্তব্য। অনেকে আহার সময়ে প্রচুর জলপান করেন, কেহ কেহ আহারের দুই কি চারি ঘণ্টা পরে জলপান করিয়া থাকেন, অভ্যাস অনুসারে সকলই সহ্য হয়। আহারের সময় অতিশয় অধিক জল পান করা উচিত নহে, আহারের কিঞ্চিৎ পরেই জল পান করা কর্ত্তব্য।

জল আমাদের যেমন উপকারী, অপরিস্কৃত জল শরীরের পক্ষে তদ্রূপ অনিষ্ট সাধন করে। ওলাউঠা প্রভৃতি ভয়ানক রোগ অপবিত্র জলপানেই উৎপন্ন হয়, এতদ্ভিন্ন উদরের পীড়া, কফ, কাশি, জ্বর প্রভৃতিও অপবিত্র জল ব্যবহার করিলে থাকে। অতএব শিশুগণ, সাবধান, অপরি[illegible]

[illegible]

না থাকিলে অন্ততঃ জলকে উত্তপ্ত ক[illegible] রূপে ছাঁকিয়া লইয়া পান করিবে।

জল ভিন্ন অন্য কোন পানীয়ই আমাদে[illegible]রের পক্ষে আবশ্যক নহে, তথাপিও অ[illegible] দেখিতে পাই, যে অনেকে জলের পরিবর্ত্তে ক[illegible]গুলি অনিষ্টকর পদার্থ সেবন করিয়া থাকেন, এ[illegible] তদ্দ্বারা অনেকগুলি কুঅভ্যাস শিক্ষা হয়। ত[illegible] সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি বিষাক্ত পদার্থ আহার[illegible] পানীয় মধ্যে গণ্য হয়। মদ তন্মধ্যে একটী। এই বিষ যতদিন সমাজের মধ্যে প্রবেশ করিয়াে[illegible] ততদিন হইতে দেশের স্বাস্থ্য, অর্থ, উন্নতি স[illegible]লেরই ঘোরতর অনিষ্ট হইতেছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে তথাপি লোকে ইহার অনিষ্টকারিত[illegible] উত্তমরূপে বুঝিতে পারিতেছে না। আমাদে[illegible] দেশের ধনী ও বিদ্বানগণ অনেকেই এই রাক্ষসী সুরার মায়ায় পতিত হইয়া ধন, মান, সকলই হারাইয়া অবশেষে অকাল-মৃত্যুর হস্তে পতিত [illegible]ছেন; তাঁহাদিগের বিদ্যা, তাঁহাদিগের বুদ্ধি দ্বারা দেশের মঙ্গল সাধন করা দূরে থাকুক, আপনাদিগের অকাল মৃত্যু দ্বারা দেশের বিধবা ও অনাথদিগের সংখ্যাই বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। অতএব শিশুগণ, এই পাপকে স্পর্শও করিও না।

সুরা শরীর পোষণের জন্য আবশ্যক নহে, এবং মনুষ্য-শরীরের প্রকৃতিই এরূপ যে কোন অনাবশ্যক পদার্থ শরীর মধ্যে নিয়মিত রূপে লইতে আরম্ভ করিলে, এক দিনে হউক, এক বৎসরে হউক, অনিষ্ট সাধন করিবেই করিবে। সুরা সম্বন্ধেও সেইরূপ। সুরাপান দ্বারা নানাবিধ রোগ উৎপন্ন হয়, সুরাপায়ী প্রায়ই অকাল-মৃত্যু-গ্রাসে পতিত হয়। এতদ্ভিন্ন সে আপনার নিকট ঘৃণিত, পরিবারের অপ্রিয় পাত্র, ও ঈশ্বরের নিকট অপরাধী [illegible] পরিবার অন্ন বস্ত্র বিনা প্রাণ-

[illegible] শরীর অসুস্থ ও মন [illegible]

হয়, সে তাহার কিছুই করিতে পারে অতএব সকলেরই এই ঘৃণিত পাপকে পরিবা কর্ত্তব্য।

া, কাফি, প্রভৃতিও ক্রমশঃ আমাদের দেশে স্ত হইতেছে। সময়ে সময়ে চা শরীরের উপকরে না, এরূপ নহে, শর্দ্দি হইলে অথবা ন্ত শীতের সময়ে গরম চা অতিশয় উপকারী, ন্তু তাহা বলিয়া এই চাকে অভ্যাসরূপে পরিণত রা উচিত নহে।

ধুমপান।—আমাদের দেশে তামাক, গাঁজা, ফিং, চরস, প্রভৃতি হুঁকায় সাজিয়া ধুম-পান রার রীতি আছে, ইহাও অতিশয় অনিষ্টকর। তামাক সকল নর নারীর নিকট উপাদেয়, কেহ স্যরূপে, কেহ শুধু তামাক পাতা, কেহ বা পোড়ান তামাক ব্যবহার করেন, কিন্তু চিকিৎসকেরা সকল প্রকার ব্যবহারকেই অনিষ্টকর বলিয়া নির্দ্দেশ য়াছেন। অতএব তামাকের অভ্যাস পরিত্যাগ ব কর্ত্তব্য। গাঁজা অতিশয় অনিষ্টকর, গাঁজাখোরেরা ভদ্রলোকের ঘৃণার পাত্র হয়, এবং তাহারা প্রায়ই রক্ত-আমাশয় ও উন্মাদ-রোগ-গ্রস্ত হইয়া থাকে। আফিং সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বিষ, অতএব এই সকল নেশার কাছেও যাইও না।

পান প্রভৃতি কতকগুলি দ্রব্য আমাদের দেশে চর্ব্বিত হইয়া থাকে। তাহা সময়ে সময়ে উপকারক, কিন্তু অধিক পরিমাণে সেবন করিলে অনিষ্ট করে। আহারের পরে দুই একটী পান চর্ব্বণ করিলে বিশেষ অনিষ্ট হয় না, বরং উপকার হয়।

ক্রমশঃ

জাহাজ।

লেবেলা গল্প শুনিয়াছিলাম একটা দৈত্য এ পিঠে করি

যদি জাহাজ না দেখিতাম, তাহা হইলে এই গল্পটী একেবারেই মিথ্যা বলিয়া মনে হইত। কিন্তু একবার জাহাজের মধ্যে গিয়া দেখিয়াছি, জাহাজগুলি বাস্তবিকই বাস্তার বাড়ীর মত। যাঁহারা পান্‌সী নৌকায় চলিয়াছেন, নৌকার মধ্যে কুঁজো হইয়া যাহাদের প্রাণ গিয়াছে, এবং যাঁহারা বড় মহাজনী নৌকা ভিন্ন জল পথে যাইবার অন্য কোনরূপ ভাল আয়োজন দেখেন নাই, জাহাজ কিরূপ জিনিশ, তাহা তাঁহারা আদবেই বুঝিবেন না। বড় বড় ঘরে সুন্দর বিছানা, পরিষ্কার খাট, বসিলে ডাবিয়া যায় এরূপ চৌকী, বাজাইবার শিখানো যন্ত্র, স্নান করিবার আলাদা ঘর, খাবার ঘর, রান্নাঘর, ডাক্তারের ঘর, কাপ্তেন সাহেবের ঘর, ভাঁড়ার ঘর, ধোবা প্রভৃতির বন্দোবস্ত, গরু ছাগল প্রভৃতির থাকিবার যায়গা, জল পরিষ্কার করার কল, ইত্যাদি সকলরূপ বন্দোবস্তই এই জাহাজের মধ্যে আছে। আর, সমুদ্র দৈত্যের মত এই জাহাজকে পিঠে করিয়া দেশে বিদেশে লইয়া বেড়াইতেছে। গল্পে যে দৈত্য ও রাজবাড়ীর কথা শুনিয়াছি, সেই দৈত্যের পিঠে রাজার বাড়ীটা ঝাকুনি খাইয়াছিল কি না, তাহা শুনি নাই, তবে সমুদ্রের পিঠে জাহাজ ভয়ানক ঝাঁকুনি খাইয়া থাকে, যাহারা প্রথম প্রথম জাহাজে উঠে, তাহাদের অনেকেরই এই ঝাঁকুনির চোটে বমি করিয়া প্রাণ যায়। জাহাজ কোন্ দিকে, কত বেগে, যাইতেছে, তাহা স্থির করিবার জন্য জাহাজের উপরে নানারূপ কল আছে, কাপ্তেন সাহেব তাহার দ্বারা সমস্ত ঠিক করিয়া থাকেন। কাপ্তেনকে বেশ লেখা পড়া জানিতে হয়, আমাদের ছাবের মাঝি বা রহমতুল্লা মাল্লার ন্যায় নিরেট মূর্খ কাপ্তেন হইলে, জাহাজকে সমুদ্রের মধ্যে তিন পা ও বাঁচিতে হয় না।

বৎসরের দ্বিতীয় সংখ্যক সখাতে আলোক-খা বলিতে গিয়া ইহা বলা হইয়াছে যে

ক ম্পগুরু মৈনাক পাহাড়ের
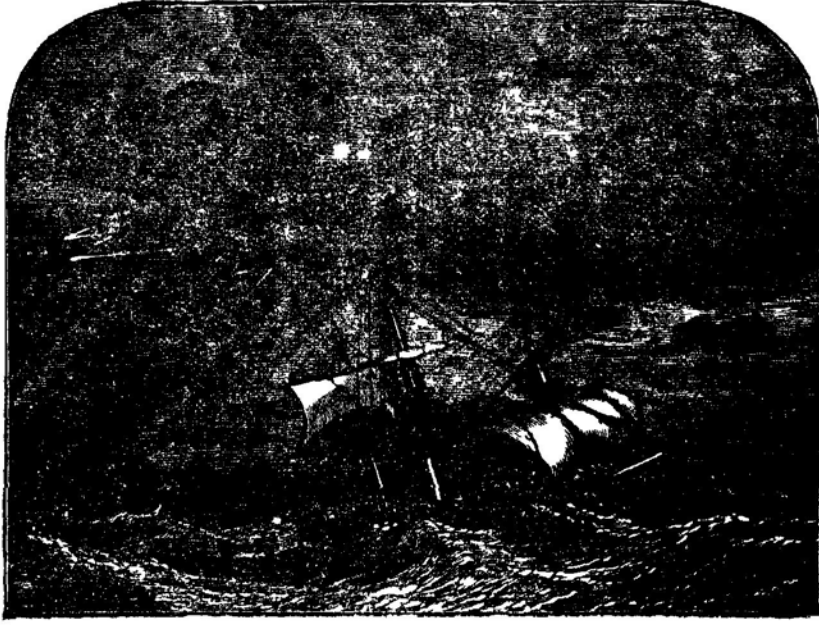
মত পাহাড় সকল জলের নীচে মাথা লুকাইয়া আছে, জাহাজ তাহাতে লাগিলেই ফাটিয়া যাইবে। যাঁহারা অনেক-কেলে. কাপ্তেন, তাঁহারা জানেন এইরূপ পাহাড় কোন্ রাস্তায় কোন্ স্থানে আছে, কাজেই তাঁহারা খুব সাবধান হইয়া চলেন ;—তবুও কি জানি, যদি পাহাড়ে পড়িয়া জাহাজ মারা যায়, আরও কত বিপদ কত সময় হইতে পারে, এই জন্য জাহাজের উপরে কতকগুলি নৌকা (আমাদের জেলে নৌকার মত ছোট) বাঁধা থাকে। দরকার হইলে, সেই নৌকাগুলিতে করিয়া জাহাজের লোকেরা বাঁচিতে পারে।

কতকগুলি জাহাজ কেবল মাল লইয়া দেশে বিদেশে যায়, অনেকগুলি লোক লইয়াও যায়। অনেক জাহাজ পাল দিয়া চলে, অনেকগুলি বাষ্পের জোরে যায়, অনেকগুলিতে পালও আছে, কলও আছে। এখন জাহাজে অনেক কাজ হয়, দেশে বিদেশে বেড়ান হয়, এ দেশে হইতে ও দেশে ডাক যায়, আবশ্যক হইলে সমুদ্রে যুদ্ধ হয়, বাণিজ্য [illegible] বেচা, [illegible] না দেশে [illegible]

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জাহাজ রাজার বাড়ীর মত ; কিন্তু মাটীর উপর ভূমিকম্প হইলে যেমন রাজার বাড়ীতেও সুখ নাই, সেইরূপ ঝড় উঠিলে সমুদ্রের বুকে জাহাজে চড়িয়া রক্ষা পাওয়া যায় না। ওই দেখ, একখানা জাহাজ ঝড়ে পড়িয়াছে। এ যাত্রা রক্ষা পাইবে কি না কে বলিতে পারে? এইরূপ বিপদে জাহাজকে মাঝে মাঝে পড়িতে হয়, তবুও লোকে জাহাজ ফেলিয়া পলায় না। জাহাজে করিয়া লোকে দেশে বিদেশে ব্যবসায় করিয়া ফেরে, তাহাতে দেশের টাকা বাড়ে, এইজন্য সকল সুসভ্য দেশের লোকই জাহাজ করিয়াছে। কেবল আমাদের দেশে নাই। আমরা কেবল টাকা পুঁজি রাখিতে ভাল বাসি, এইরূপ স্বাধীনভাবে বাণিজ্য কারবারে টাকা খাটাইতে চাই না, এই জন্য আমাদের দেশের টাকা বাড়েনা। এইরূপ দেশে বিদেশে কারবার করিয়া বেড়াইলে যে কেবল টাকা বাড়ে [illegible] নূতন জ্ঞান জন্মে, অনেক সাহস

[illegible] ইংরাজেরা যে এত বড়

অনেককাল হইতেই এইরূপ দেশে বিদেশে কারব করিয়া বেড়াইতেছে।

বালকদিগের মনে মনে প্রতিজ্ঞা করা উচিত যে যখন বড় হইব, হাতে টাকা হইবে, তখন সাধ্যমত স্বাধীন ব্যবসায় করিবার চেষ্টা করিব। পরের চাকর না হইয়া নিজের ইচ্ছামত কাজ করিতে পারার চেয়ে আর কি সুখ আছে?

একদিন গঙ্গার ধারে বেড়াইতেছিলাম; গঙ্গায় সকল জাতিরই জাহাজ আছে, আমাদের নাই, ইহা দেখিয়া মনে বড় দুঃখ হইয়াছিল; তাই আজ এত কথা লিখিলাম। সখার পাঠকদিগের মধ্যে জমিদারের ছেলে অনেকে আছেন, তাহারা যেন বড় হইয়া এই কথাগুলি ভাবিয়া দেখেন।

তাজ মহল।

বালক বালিকাগণ! তোমরা অনেকেই আগ্রার সুবিখ্যাত তাজ মহলের কথা ইতিহাসে পাঠ করিয়াছ। আগ্রা নগরী কলিকাতা হইতে ৪২১ ক্রোশ দূরে,—পূর্ব্বে কলিকাতা হইতে হাঁটিয়া যাইতে অনেক সময় লাগিত। লর্ড লরেন্স যখন আমাদের গবর্ণর জেনেরল ছিলেন, তখন তিনি অতি দ্রুতগামী ঘোড়ার ডাক বসাইয়াও ১৫ দিনের পূর্ব্বে আগ্রা হইতে কলিকাতার সংবাদ আনাইতে পারেন নাই। এখন রেল গাড়ী হওয়াতে যাইবার খুব সুবিধা হইয়াছে। এখন আগ্রা যাইতে মোটে ত্রিশ ঘণ্টা লাগে।

তোমরা জান আমাদের দেশে পূর্ব্বে মুসলমান বাদসাহরা রাজত্ব করিতেন। বাদসাহরা সকলেই খুব জাঁক-জমক-প্রিয় ছিলেন, ইঁহাদের মধ্যে আবার সাজাহান নামক একজন বাদসাহ বিশেষ সৌখীন ছিলেন। তাঁহার সময়ে দিল্লীর সম্পদ খুব বৃদ্ধি পায়; কবিয়া ইনি দিল্লীর শোভা বাড়াইয়া যান। যে ময়ূর সিংহাসনের কথা তোমরা ইতিহাসে পাঠ করিয়াছ তাহা ইনিই সখ করিয়া নিজের জন্য তৈয়ার করেন। যে একটী কোহিনুর আমাদের মহারাণী মুকুটে পরিয়া আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করেন, সেইরূপ কতকত মণি উক্ত সিংহাসনের শোভা বর্দ্ধন করিত। আগ্রার তাজ মহলও এই বাদসাহের আদেশে নির্ম্মিত হয়। সাজাহান বাদসাহের মমতাজমহল নাম্নী এক প্রিয়তমা বেগম অর্থাৎ রাণী ছিলেন, তাঁহার মৃত্যু হইলে বাদসা তাঁহার গোরের উপর এই মনোহর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন। বেগমের নামানুসারে এই প্রাসাদেরও একটী নাম মমতাজ মহল ছিল; ক্রমে তাহা হইতেই তাজ মহল হইয়াছে। আগ্রার অনধিক এক ক্রোশ দূরে যমুনাতীরে এই অপূর্ব্ব অট্টালিকা শোভা পাইতেছে। যে তোরণ অর্থাৎ ফটক দ্বারা তাজ মহলে প্রবেশ করিতে হয়, তাহা দেখিতে অত্যন্ত উচ্চ ও অতি সুন্দর। এই তোরণ রক্তবর্ণ পাথরে নির্ম্মিত; ইহার গাত্রে যে সকল শিল্পকার্য্য রহিয়াছে তাহারই বা শোভা কত। এইরূপ আরও তিনটী তোরণ অপর তিন দিকে শোভা পাইতেছে। তোরণ অতিক্রম করিলেই শ্বেতপাথর-নির্ম্মিত একটী অত্যন্ত দীর্ঘ চৌবাচ্চা দেখিতে পাইবে, এই চৌবাচ্চার মধ্যে ৩।৪ হাত দূরে দূরে এক একটী ফোয়ারা আছে, এই সকল ফোয়ারা হইতে এখনও মধ্যে মধ্যে জল-ক্রিয়া হইয়া থাকে। চৌবাচ্চার পার্শ্বে যে সুপ্রশস্ত পথ আছে তাঁহা বৃক্ষাদিতে এরূপ ঢাকা যে অত্যন্ত রৌদ্রের সময়েও সেখানে রৌদ্রের তাপ লাগে না। তাজমহলের তিন দিক মনোহর বাগান দ্বারা বেষ্টিত, অপরদিকে যমুনা নদী। বাগানটী দেখিতে বড় সুন্দর। ইহার মধ্যে দারুচিনি, চন্দন প্রভৃতি অনেক বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়।

৩৪ ত্রিতল ... উপর তাজ মহল

স্থাপিত। যে সুন্দর শ্বেত পাথরের দুই একখানা বাসন পাইয়া আমরা কত সন্তুষ্ট হই, সেইরূপ শ্বেত পাথরের দ্বারা ইহার আগাগোড়া নির্ম্মিত। তাজের চারি কোণে চারিটী স্তম্ভ প্রহরীর ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে, ইহাদের প্রত্যেকের উচ্চতা ২২৫ ফিট। তাজ মহলের উপর ও মধ্যভাগ নানা বর্ণের বহুমূল্য প্রস্তর-খচিত সুন্দর সুন্দর ফুলে সুশোভিত।* এক একটী ফুলের পাপড়ী নির্ম্মাণে ৮।১০ প্রকার বিভিন্ন রঙ্গের ছোট ছোট পাথর লাগান হইয়াছে। যে রঙ্গের পর যেটী দিলে ঠিক স্বাভাবিক ফুলের মত দেখায়, সেই সেই রং ক্রমে সাজাইয়া এক একটী ফুল রচিত হইয়াছে। পাথর-গুলি এরূপ দৃঢ় বদ্ধ যে দেখিলে পাথরের যোড়া বলিয়া কোন মতেই বোধ হয় না। খুব ভাল করিয়া দেখিলেও বোধ হয় যেন কোন এক সুনিপুণ চিত্রকরের তুলিকায় এ সমস্ত চিত্রিত হইয়াছে। দূর হইতে বোধ হয় যেন একটি প্রকাণ্ড পাথরের ক্ষেত্রে হাজার হাজার স্বর্গীয় ফুল ফুটিয়া শোভা বিস্তার করিতেছে। তাজমহলের দ্বারের উপরিভাগে পারস্য ভাষায় মুসলমানদের ধর্ম্ম-পুস্তক কোরাণ হইতে সুন্দর সুন্দর কবিতা সকল কৃষ্ণবর্ণ মার্ব্বেল প্রস্তরে অঙ্কিত হইয়া শোভা পাইতেছে।

সূর্য্য উদয় হইবার কিছু পূর্ব্বে তাজ মন্দির ঈষৎ নীল, সূর্য্য উদয় হইবার পর গোলাপী এবং অস্ত হইবার সময় লাল বর্ণ দেখা যায়। চন্দ্রের আলোকে তাজ সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর দেখায়।

রাজ্ঞীর গোরস্থান প্রাসাদের সর্ব্ব নিম্নতলে, স্থানটী অত্যন্ত অন্ধকারময়, এজন্য তথায় আলো লইয়া যাইতে হয়। সমাধি-স্থান নানাবিধ বহুমূল্য মণি ও প্রস্তরের কারুকার্য্যে শোভিত। রাজ্ঞীর সমাধির পার্শ্বেই সম্রাট সাজাহানের সমাধি স্থান;— সেটিও দেখিতে যারপর নাই মনোহর। তাজের দুটী রূপার কপাট ছিল; উক্ত কপাটে দশ হাজারেরও অধিক প্রেক লাগান ছিল; এবং প্রত্যেক প্রেকের উপরে এক একটী মোহর স্থাপিত ছিল। কিন্তু এখন আর সে সকল কিছুই নাই। প্রায় আশি বৎসর গত হইল জাঠেরা তাহা লুঠ করিয়া লইয়া গলাইয়া ফেলে।

১৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে তাজমহল নির্ম্মাণের উদ্যোগ হয়। ১৭ বৎসর কেবল মূল্যবান প্রস্তর প্রভৃতি সংগ্রহ করিতে যায়; পরে বিশহাজার লোক ১৭ বৎসর পরিশ্রম করিয়া এই বৃহৎ ব্যাপারটী সমাপ্ত করে। ইহা যে কি প্রকাণ্ড ব্যাপার তোমরা ইহাতেই বুঝিতে পারিবে।

উপরে অতি সংক্ষেপে তাজমহলের বর্ণনা লেখা গেল, স্বচক্ষে না দেখিলে ইহার সৌন্দর্য্য কিছুই বুঝা যায়না; ভাষাতে এমন কথা নাই যাহা দ্বারা তাজ মহলের ঠিক বর্ণনা করা যাইতে পারে। একজন ভ্রমণকারী তাজ দেখিয়া লিখিয়াছেন—"পৃথিবীতে তাজের তুলনা করা যায় এমন কিছুই নাই, তাজই তাজের তুলনার স্থল।"

ঠাকুরদাদার গল্প।

দ্য নবীন বাবু তাঁহার বালক-সেনা সঙ্গে করিয়া মাঠে বেড়াইতে চলিয়াছেন; কিশোরী, মন্মথ, অমূল্য, চন্দ্রনাথ বিনয়, নগেন, দেবেন, নলিন প্রভৃতি বালকগণ মহা আহ্লাদে প্রফুল্ল হইয়া হাতধরাধরি করিয়া যাইতেছে। দেখিতে বড় সুন্দর। সকলেরই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় পরা, কাহারও বনাতের ডবলব্রেষ্ট কোট, কেহ বা কোট র‍্যাপার গায়, কাহারও শালের রুমাল, সকলে হৃষ্টপুষ্ট ও সুশ্রী।

---

* এরূপ শুনা যায় যে এই কার্য্যে পূর্ব্বে যে সকল বহুমূল্য পাথর লাগান হইয়াছিল, ইংরাজেরা সেগুলি খুলিয়া লইয়া তাহার বদলে নকল-পাথর বসাইয়া দিয়াছে। একথা সত্য কি না বলা যায় না। সখা-সম্পাদক।

প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে ভ্রমণ ও শ্রম করিয়া এবং সৎ বিষয়ের আলোচনাতে ও সৎসঙ্গে সকলেই সৎচরিত্র ও সুস্থশরীর লইয়া কেমন এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে যেন পথ আলো করিয়া চলিয়াছে। এতগুলি ছোট বালক তাঁহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসে ও ভক্তি করে, ও তাহারা সকলেই তাঁহার উপদেশে সুশিক্ষিত ও সচ্চরিত্র হইতেছে, ইহা ভাবিয়া আজ নবীন বাবুর বড়ই আনন্দ হইতেছে, সেই আহ্লাদ তাঁহার চক্ষু ও মুখে যেন মাখান রহিয়াছে। তিনি যতবার তাহাদের দিকে দেখিতেছেন, যতবার তাহাদের সরল ভাব ও সুহাস্য বদন, উৎসাহের চলন ও উৎসুক কথোপকথনের বিষয় মনে মনে আলোচনা করিতেছেন, ততই আনন্দে তাঁহার বক্ষঃস্থল যেন বাড়িয়া উঠিতেছে। আজ কোন্ বিষয়ে কথা বার্ত্তা হইবে তাই লইয়া বড় তর্ক হইতেছে; কেহ বলিতেছেন "আজ মাধ্যাকর্ষণটা ভাল করিয়া বুঝিব।" কেহ বা আজ গঙ্গার কথা তুলিবে বলিতেছে, কেহ ঈশ্বরের কথা জিজ্ঞাসা করিবে বলিতেছে। এইরূপে সকলে ভিন্ন ভিন্ন মত দিতেছে, শেষে স্থির হইল—"দাদা মশাই যা ভাল বিবেচনা করেন তাই হবে।" নলিন বাবু চিরকালই সমান চঞ্চল। হঠাৎ পথে একটা দড়ী দেখিয়া সেটা লইলেন ও তথায় বসিয়া তাহার একদিকে একটী ইষ্টক খণ্ড (ঢিল) বাঁধিলেন। আর সকলে অনেক দূর গেল, তাঁহাকে ডাকিতে লাগিল,—

মহা কাজে ব্যস্ত, ভ্রূক্ষেপই নাই। পরে যখন মনের মত হইল, তখন 'হুঁ উ—উ—উ" করিয়া একটা শব্দ করিতে করিতে দড়ীর অপর দিকে ধরিয়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে একছুট। দড়ীটা "বোঁ বোঁ" শব্দে ঘুরিতে লাগিল। ক্রমে সকলে মাঠে পঁহুছিলেন। একটী উচ্চ স্থানে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি করিয়া সকলে নবীন বাবুকে ঘেরিয়া বসিলেন। নলিনের ইচ্ছা যে সেখান হইতে উঠিয়া গিয়া সেই ঢিলটা ঘোরায়। তাহা দেখিয়া নবীন বাবু বলিলেন "ভাল, নলিন তুমি যে ওটা ঘোরাচ্ছ, বল দেখি ঢিলটী অমন ঘুরিতেছে কেন?" নলু বাবু মহা খুসী, "ঘুরছে কেন বলব? আচ্ছা, এই দেখ। এই,—এই একদিকে ধ'রলাম, আর এই জোর দিলাম, আর, অমনি ঘুরতে লাগল। এ আর আশ্চর্য্য কি?" নলিন আবার ঘুরাইতে লাগিল।

তখন নবীন বাবু আর সকলের দিকে তাকাইয়া বলিলেন "নলিন ত পারিবেই না তোমরা কে পার বল দেখি?" বিনয় বলিল "পৃথিবী আকর্ষণ করিতেছে বলিয়া", মন্মথ বলিল "তা নয়, দড়ীতে বাঁধা আছে বলিয়া।" কিশোরী বলিল:—"দুইই ঠিক, পৃথিবীও টানিতেছে দড়ীতেও বাঁধা আছে, দুদিক হইতেই টান পড়িতেছে এই জন্য ঘুরিতেছে।" নবীন বাবু সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—"বেশ বলিয়াছ; কেবল দড়ীতে ওরূপে ঘুরিতনা, আবার কেবল ঢিলটীও ঘুরিতনা, ছুড়িয়া দিলে চলিয়া যাইত, দুটী কারণেই বটে। কিন্তু আর একটু স্পষ্টরূপে বুঝিতে হইবে। মনোযোগ দাও; আজ এই বিষয়েই কথা বলিব।"

"সেদিন বলিয়াছি সমস্ত জগৎ, সমস্ত বিশ্বসংসার, কেবল মাত্র সূক্ষ্ম পরমাণুর সমষ্টি। এই পরমাণু-পুঞ্জকে একত্র করিয়া রাখিয়াছে কে? (সকলে "আণবিক আকর্ষণ") বেশ। আকর্ষণ কি? এক প্রকার শক্তি। এই আকর্ষণ শক্তি না থাকিলে পৃথিবী, বৃক্ষ, লতা, জীব, জন্তু, আকাশে সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র কিছুই থাকিতনা। কেবল বিন্দু বিন্দু পরমাণু অসীম আকাশমণ্ডল ব্যাপ্ত হইয়া ছড়াইয়া থাকিত। বুঝিলে আকর্ষণ কত প্রয়োজনীয়? এই শক্তি যে কেবল পদার্থ সকলকে নির্দ্দিষ্ট আকারে রাখে, এমন নহে; এমন স্থান নাই, এমন জীব নাই, যাহা এই মহতী শক্তির অভাবে শূন্য হইয়া না যাইত। আমি যে কথা কহিতেছি, নড়িতেছি, ঐ যে ফড়িংটী উড়িতেছে, সব এই শক্তির গুণে। ক্রমে বুঝিতে পারিবে, এখন প্রথমতঃ একটী কথা কখনও

ভুলিও না, যে পরমাণু নির্জ্জীব অচেতন পদার্থ মাত্র। তাহার উপর এই শক্তি যতক্ষণ না কার্য্য করিবে ততক্ষণ তাহার সাধ্য নাই যে স্থান পরিবর্ত্তন করে। এই যে যুতা রাখিয়াছি যতক্ষণ উহাকে না নাড়িব ততক্ষণ উহা নড়িবে না। এই যে চাদর রহিল, না তুলিলে কখন উহা উঠিবেনা।" চন্দ্রনাথ বলিল, "কেন বাতাস এলেই ত উড়ে যাবে?" নবীন বাবু:—সেও ত বায়ুর শক্তিতে যাবে, আমার হাতের শক্তিতে যাইত, না হইয়া বায়ুর শক্তিতে উড়িল, তথাপি নিজে ত পারিল না। জড় পদার্থের সে ক্ষমতা নাই। কিশোরী:—আচ্ছা তবে আমার হাতও ত পরমাণুতে প্রস্তুত, তবে উহা নড়ে কেন? নবীন বাবু:—হাত জড় পদার্থ বটে কিন্তু উহার শিরার মধ্যে যে রক্ত আছে তাহা দ্বারা এমন একটা কার্য্য হইতেছে যে তন্মধ্যে শক্তি সঞ্চিত আছে, তজ্জন্য আমরা ও অন্যান্য জন্তুরা এবং উদ্ভিদেরা জীবিত থাকি। জীবন আর কিছুই নহে কেবল রক্তের এই কার্য্য করিবার শক্তিটুকু মাত্র, গলা কাটিলে রক্ত বাহির হইয়া যায়, আমার এই হাত আর তখন কর্ম্মক্ষম থাকিবে না।

অমূল্য:—রক্তের যে শক্তি আছে, উহা লৌহ বা প্রস্তরের নাই কেন? নবীন বাবু:—ঈশ্বর সৃষ্ট পদার্থের কোন্‌টীতে কোন্ গুণ দিয়াছেন তাহাই যখন আমরা জানিনা, কেন দিয়াছেন বা কেন দেন নাই তাহা আমরা কেমন করিয়া জানিব? লৌহ প্রস্তরাদি বস্তুর মধ্যে এই পরিমাণে শক্তি দিয়াছেন যেন তাহারা জমাট হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু অন্য কোনরূপ চেতনা শক্তি দেন নাই, অগ্নিতে কেমন এক নূতনবিধ শক্তি দিয়াছেন তাহা যাহাতে লাগে তাহাই ভস্ম হইয়া যায়। সেইরূপ বৃক্ষাদিতে কিয়ৎ পরিমাণে বর্দ্ধন শক্তি দিয়া, জন্তুগণকে চলিবার শক্তি দিয়াছেন, এবং সর্ব্বোপরি মানবকে জড় শক্তি ও অস্থির বুদ্ধি ও বিচার শক্তি দিয়া সৃষ্ট পদার্থের শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন। কেন করিয়াছেন, একথা জিজ্ঞাসা করা বৃথা; তাঁহার সীমা অপার, ইচ্ছা ও কৌশল অসীম, তাঁহার বুদ্ধির ইয়ত্তা হয় না। তিনি অনন্ত, তাঁহার সৃষ্টির যেটুকু জানিতে পারা যায়, তাই জানিতে চেষ্টা করি এস।

শক্তি বিনা পরমাণুর সমষ্টি হয়না, শক্তি বিনা পরমাণু সমষ্টির গতিও হয়না। জড়মাত্রেরই সর্ব্বপ্রধান গুণ নিশ্চলতা বা জড়ত্ব। শক্তি ব্যতীত আর কিছুরই সাধ্য নাই যে জড় পদার্থকে নাড়িতে পারে। মনে করিয়া রাখ এইটী জড় বস্তু মাত্রেরই প্রথম গুণ। উহার তদ্রূপ আর একটী বড় দরকারী গুণ আছে সেটী এই:—কোন বস্তুকে একবার এক দিকে যেই চালাইয়া দিবে, অমনি সেই বস্তু সেই দিকে চলিতে থাকিবে, আর কখনই থামিবে না, যদি তাহাতে আর কোন শক্তি কার্য্য না করে। বুঝিতে চেষ্টা কর। এটী একটু কঠিন। কোন পর্ব্বতের উপর একটী পাথরের ঢিল রহিয়াছে, যদি কিছুতে তাহাকে স্থানচ্যুত না করে, তবে চিরকালই সেইখানে রহিবে, নড়িবে না (প্রথমগুণ)। কিন্তু একবার তাহাকে নীচের দিকে ফেলিয়া দাও, তখনই পড়িবে ও তাহার গতি আর বন্ধ হইবেনা, সে পৃথিবীর আকর্ষণে পড়িতেছে, ক্রমিক পড়িবে, যতক্ষণ না কিছুতে তাহার বেগ বন্ধ করিবে, ততক্ষণ থামিবেনা (দ্বিতীয় গুণ)। যেই মাটীতে পড়িবে, অমনি আঘাত পাইয়া থামিয়া যাইবে। বুঝিলে? দেবেন্দ্র:—আপনি বলিলেন জড়বস্তুকে যেদিকে চালাইব সেই দিকে চিরকালই চলিবে, তা কৈ হয়? উপরে ঢিল ছুড়িয়া দিলে একটু পরে পড়িয়া যায় কেন?

কিশোরী:—বা বোকা! এই বুঝি শুনিলে? সেই দিকে চিরকাল চলিবে—যদি আর কোন শক্তি না থাকে। তা ওখানে তুমি তাকে উপর দিকে ছুড়িলে আর পৃথিবী যে তাকে নীচে হইতে টানিতেছে, তবেইত হইল, তোমার ছোড়ার জোর যতক্ষণ ছিল, ততক্ষণ উপর দিকে গিয়া, আবার পৃথিবীর টানে মাটীতে পড়িয়া গেল। না দাদা?

নবীন বাবুঃ—বাস্তবিক তুমিই বেশ বুঝিতে পার, আর কেহ বোধ হয় তত মন দেযনা। নগেন বলিল "হাঁ তা বৈ কি? আব উনি যে আমাদেব চেয়ে কত বড়? তা বুঝি হবেনা? তবু আমি কেমন বুঝিতে পারিতেছি।" সকলেই হাসিলেন। নবীন বাবু ঃ—তবেই দেখ, জড় পদার্থের দুটী গুণ, এক আপনা হইতে চলিতে পারেনা, আর চালাইযা দিলে না থামাইলে থামেনা।—এই কথা বলিতে বলিতে মাঠের অন্য দিকে একটা ভযানক গোল উঠিল, বালকগণ এবং নিজে ঠাকুরদাদা- সকলেই সেই দিকে ছুটিলেন, কাজেই এইখানে কথা থামিল।

আমাদের দেশের বড়লোক।

তবৎসর আমরা অনেক সাহেবেব কথা লিখিয়াছি, কাবণ তাঁহাদেব চবিত্রে এমন গুণ ছিল, যাহা বালকবালিকা-দিগেব থাকা উচিত। কিন্তু সাহেবদেব কথা লিখিযাছি বলিযা যে আমাদেব দেশে বড়লোক নাই, ইহা যেন কেহ মনে না কবেন। সকল দেশেই ভাল লোক আছেন, পবমেশ্বব যে এক দেশেই ভাললোকদেব বাড়ী কবিয়া দিযাছেন, সে দেশেব বাহিরে যে আব ভাল-লোক হইতে পারেনা, একথা মনে কবা বড় অন্যায়। কেন? আমাদেব দেশে কি ভাল লোক নাই? আমাদেব দেশে কি এমন লোক নাই যাঁহারা অতি গবিব অবস্থা হইতে কেবল নিজেদের চেষ্টায়, নিজেদের যত্নে ও পবিশ্রমে, নিজেদের ভাল চরিত্রের গুণে বড় লোক হইয়াছেন? আমা-দের দেশে কি এমন লোক নাই যাঁহারা যে কাজ-টীকে ভাল বলিয়া বুঝিয়াছেন, বুকের রক্ত দিয়া সেই কাজ করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন? আমা-দের দেশে কি এমন লোক নাই যাঁহারা বড় লো-কের ঘরে জন্মিয়া সৎকার্য্য করিবার জন্য নিজেদের টাকা কড়ি দুই হাতে দেশময় ছড়াইয়া দিতেছেন? আমাদের দেশে অনেক ভাল লোক, অনেক বড় লোক আছেন। তবে সাহেবদের দেশে যেমন একজন বড়লোক হইলে দশজনে তাহাব জীবন-চবিত লেখে, সে কখন কোন্ কাজটী কবিল, কখন কি কথা বলিল, তাহা সাবধানে টুকিয়া রাখে, আমা-দেব দেশে সেরূপ নাই। তাই আমাদেব দেশেব অনেক ভাল লোকেব কথা সময়ে মুছিযা গিযাছে, অথবা কেবল দুই চাবিজন সেকেলে লোকের মুখেই শুনা যায়।

আমবা গতবৎসব বলিযাছি, আমাদের দেশেব বড়লোকদেব জীবন চবিত লিখিব, তাই আমবা আজ একজন বড়লোকেব জীবনেব একটী গল্প বলিতেছি। লম্বা চৌড়া জীবনচবিত লিখিতে আমবা ইচ্ছা কবি না, কাবণ যে সকল কাজে কোন লোকেব চবিত্রেব গুণ বাহির হয়, সেই সকল কাজেব কথা ছাড়া, তিনি কেমন করিয়া চলিতেন, দেখিতে কিরূপ ছিলেন, কি দিয়ে ভাত খেতেন, এ সকল কথা জানিযা আমাদেব কি প্রযোজন?

দ্বাবকানাথ ঠাকুব তাঁহাদেব সমযে কলিকাতার একজন বড়লোক ছিলেন। অনেকেব বিশ্বাস আছে টাকায় বড়লোক হইলেই বুঝি স্বভাব চবি-ত্রেব বিষযে ছোট লোক হইতে হয। অনেককে দেখিতে পাই তাঁহারা বড়লোকেব নাম শুনিলেই "বাপবে! বড়লোক!" বলিযা চমকিয়া উঠেন, সাপের নিকট যাইতে হইতে মানুষ যেমন ভযে ভয়ে যায়, অনেকে বড়লোকের নিকট যাইতে হইলে সেইরূপ ভয়ে ভয়ে যান, দরজায় ভোজপুরী দ্বারবান পাহারা দিতেছে, নোংরা কাপড় দেখিলে এখনই অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিবে, এই ভয়ে অনেক লোক সাধ্য থাকিতে বড়লোকের বাড়ীর ছায়াতেও যান না। কিন্তু আমরা জানি এরূপ বড়লোক অনেক আছেন, যাঁহারা টাকা পাইয়া অহঙ্কারে ফুলিয়া উঠেন নাই, যাঁহারা অত্যন্ত দয়ার সহিত দুঃখীকে সাহায্য করিয়া থাকেন।"

দ্বারকানাথ ঠাকুর এইরূপ বড়লোকের মধ্যে একজন। ইহাঁর মন কত উচু ছিল, একটী গল্প বলিলেই বুঝা যাইবে। একবার দ্বারকানাথ ঠাকুর এই কলিকাতায় অনেক টাকায় একটী বাড়ী কিনিয়াছিলেন।—বাড়ীটী ইহার পূর্ব্বে যাঁহাদের ছিল, তাঁহারা পাওনা টাকা দিতে পারেন নাই বলিয়া বাড়ীটী বিক্রী হইয়া যায়।

দ্বারকানাথ ঠাকুর সেই বাড়ী দখল করিতে অর্থাৎ নিজের হাতে আনিতে গেলেন। তিনি যখন সেই বাড়ীতে গেলেন, তখন গিয়া শুনিলেন উপরে জানালায় একটী বালক তাহার মায়ের সহিত কথা কহিতেছে; মাকে মুখ ভার করিয়া থাকিতে দেখিয়া বালক বলিতেছে "কিমা! তুমি অমন করে আছ কেন?" মা বলিলেন "বাবা! আমাদিগের এই বাড়ী দেনার জন্য বিক্রী হয়ে গেছে; যিনি কিনেছেন তিনি আমাদের তুলে দেবেন।" বালক মায়ের দুঃখের কথা শুনিয়া বলিল "কোথায় যাব মা, তা হলে?" মা নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন "বাছা! ভগবান যেখানে রাখেন সেইখানে থাকিব।" বালক আর কিছু বলিলনা।—যাঁহার বাড়ী তিনি বাঁচিয়া নাই, তাহার বিধবা স্ত্রী একটী ছেলেকে লইয়া এমন কষ্টে পড়িয়াছেন, শুনিয়া দয়াবান দ্বারকানাথের চোখ দিয়া ঝর্ ঝর্ করে জল পড়িতে লাগিল। তিনি বালকটীকে তাঁহার নিকটে আনাইলেন। তাহার পর তাহাকে কোলে লইয়া মিষ্ট কথায় জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি বল্‌ছিলে, বাবা?" বালক একটু থত মত খাইয়া বলিল। দ্বারকানাথ দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন "না! না! তোমাদের কোথাও যেতে হবেনা। এটা তোমাদেরই বাড়ী।" এই বলিয়া সেই বালকের হাতে কিছু টাকা দিয়া বাড়ী ফিরিয়া গেলেন। বাড়ীতে পৌঁছিয়াই তিনি একখানি দানপত্র প্রস্তুত করিলেন, এবং সেই বালককে বাড়ীটী লিখিয়া দিলেন। বলদেখি কত উচু মনের কাজ?

মদ্য-পানের ফল।

(২নং)

'ভিক্ষা দাও গো!'

ই যে দুঃখিনী স্ত্রীলোক ছেঁড়া কাপড় পরিয়া, শুষ্ক মুখে, দুটী ছোট মেয়েকে লইয়া, "ভিক্ষা দাও গো" বলিয়া তোমার দ্বারে দাঁড়াইল, উহাকে চেন? কে উহার এ দুর্দ্দশা করিল? উহাকে দেখিলেতো ভিখারীর মেয়ে বলিয়া মনে হয় না। মুখে কেমন একটু লজ্জা রহিয়াছে—চক্ষু যেন ছল ছল করিতেছে, দেখিলেই বোধ হয় বড় কষ্টে পড়িয়াছে, তাই তোমার দ্বারে, নতুবা আসিত না! আহা! উহার সমস্ত দুর্দ্দশার কথা শুনিতে চাও, তবে শোন।

বসন্তপুর নামক গ্রামে কেদারনাথের মত ভাল ছেলে কে ছিল? তাহার হাসি হাসি মুখখানি, বিনম্র ব্যবহার, লেখাপড়ায় মনোযোগ, ছোট ভাই বোনের প্রতি ভালবাসা, এসকল যিনি একবার দেখিয়াছেন, তিনিই বলিয়াছেন, কেদার এর পরে একজন বড় লোক হইবে। কেদার জাতিতে কায়স্থ ছিল, কিন্তু বসন্তপুর গ্রামে কেদারকে সকলেই দেবতার ছেলের ন্যায় ভক্তি করিত। সেই গ্রামের একটী ছাত্রবৃত্তি স্কুলে কেদার বরাবর পড়িয়া প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হইয়া উঠিল। কেদারের মা বাপের কত আশা! তাঁহারা বড় গরিব, বিদেশে পয়সা খরচ করিয়া কেদারকে পড়াইবেন, এরূপ সঙ্গতি নাই, মনে ভাবিলেন এইবার পরীক্ষা দিয়া কেদার যদি বৃত্তি পায়, তাহা হইলে সে একটু লেখাপড়া শিখিয়া মানুষ হয় এবং তাঁহাদেরও আর কষ্ট থাকে না। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার ফলে বাপ মায়ের আশা পূর্ণ হইল। পরীক্ষার প্রায় ২ মাস পরে একদিন পাড়ার দুর্গাচরণ বাবু আসিয়া কেদারের বাপকে বলিয়া গেলেন তাঁহার কেদার 'জলপানি' পাইয়াছে। কি আনন্দ! কেদারের মা বাপের সুখে

সকলেই সুখী হইলেন। কিন্তু ৪ টাকা বৃত্তিতে সমস্ত খরচ চালান ত সহজ নহে—কেদার কোথায় যায়? তাহারও বন্দোবস্ত হইল। কিছু দূরে কোন গ্রামে একটী এন্ট্রান্স্ স্কুল ছিল, তথায় পড়িবার জন্য কেদারকে সেইখানে পাঠান হইল। কেদার কায়স্থের ছেলে, ঘরের একটু একটু কাজ করিয়া দিবে, এইরূপ কথাতে সম্মত হইয়া সেই গ্রামের বড় একটী ভদ্রলোক কেদারকে নিজের বাড়ীতে স্থান দিলেন। কেদার সেইখানে থাকিয়া লেখাপড়া করিতে লাগিল। অল্প দিনের মধ্যেই অনেকে কেদারকে ভাল ছেলে বলিয়া চিনিল। সেই গ্রামে কেদারের অপেক্ষা বয়সে বড় অনেক বাবু কেদারকে ডাকিয়া তাহার সহিত আলাপ করেন, নানা রকম কথাবার্ত্তা বলেন; কেদার গরিব বেচারা, বয়সে বড়, টাকা কড়িতে বড়, বাবুদের সঙ্গে মিশিয়া নিজেকে একটু সুখী, একটু কৃতার্থ মনে করে। ইহাতেই কেদারের কপাল পুড়িল।

তিন চার বছর মিশিয়া মিশিয়া কেদারের মনে বিশ্বাস হইল, "ইঁহারা আমা অপেক্ষা যখন অনেক বেশী জানেন, তখন ইঁহাদের কথা অনুসারে চলা উচিত, তবে কখন কখন যে সকল খারাপ বিষয়ের আলোচনা করেন, তাহা শুনিলে দোষ কি, সেইরূপ কাজ না করিলেই হইল।" এইরূপ ভাবিয়াই কেদার ধীরে ধীরে পাপের দিকে যাইতে লাগিল। তাহার মনে একদিন পাপের প্রতি যে ভয়ানক ঘৃণা ছিল, তাহা ধীরে ধীরে কমিয়া যাইতে লাগিল। বয়সের বড় যাঁহারা, তাঁহারা অনেক খারাপ বিষয়ের কথাও হয়ত বলিয়া থাকেন, সুতরাং বালক কেদারের সেখানে যাওয়া উচিত নয়, তাহাদের সহিত অধিক মেশা উচিত নয়, এইরূপ কথা অনেকে বলিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পড়া শুনায় কেদারের যখন কিছুই ত্রুটি নাই, তখন তাহাকে কে সাহস করিয়া বারণ করে? কেদার সর্ব্বনাশের পথে যাইতে বসিল।

যখন কেদার দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে, তখন তাহার বিবাহ হইল। বিবাহ করিয়া তাহার সর্ব্বনাশের পথ আর একটু পরিষ্কার হইল। তাহার সঙ্গীগণ এই উপলক্ষে তাহাকে এরূপ কুৎসিত ঠাট্টা করিতে লাগিলেন, যে শুনিলে অবাক্ হইতে হয়। এক দিন তাঁহার একজন বন্ধু বলিলেন, "ভাই, নূতন বিবাহ করিলে, আমাদের কিছু নূতন জিনিষ খাওয়াও।" মিঠাই, সন্দেশ, প্রভৃতি, অনেক জিনিষের নাম করা হইল, কিছুই বাবুদের পসন্দ হইল না, কারণ তাহা নূতন নহে এবং তাহার দাম অনেক। অবশেষে একজন বলিলেন "এক বোতল মদ আন—চারি আনা হ'লেই সকলের চলিবে।" কেদার প্রথম একটু আপত্তি করিল, শেষে ভাবিল "তা, আমিত খাবনা, ইহাদের দিই না কেন।"—মদ আসিল। হো! হো! করিয়া সকলে মদ খাইলেন। কেদারকে ছাড়ে কে? চক্ষুলজ্জায় তাহাকেও খাইতে হইল।

একদিন খাইলে আর তাহাকে ছাড়ে কে? "আমি মদ খাইনা" একথা বলিবার যো নাই, অথচ "মদ খাইবনা" এতটুকু মুখের জোরও নাই, কাজেই কেদার গেল।

এইবার কেদারের এন্ট্রান্স দিবার বছর কিন্তু দলে পড়িয়া কেদারের পড়া শুনার দিকে অধিক মন রহিল না। এদিকে যে বাড়ীতে কেদার ছিল, সেই বাড়ীর কর্ত্তা কেদারের খারাপ চরিত্রের কথা শুনিয়া তাহাকে বাড়ী হইতে চলিয়া যাইতে বলিলেন। কেদার অহঙ্কার এবং রাগে পূর্ণ হইয়া চলিয়া গেল। তাহার পর কি হইল, তাহা আমরা বলিব না; ভয়ানক কষ্টে, ভয়ানক দুঃখে, কেদারের দিন যাইতে লাগিল। এন্ট্রান্স পরীক্ষাতো কোথায় গেল! ক্রমাগত ৭ বছরকাল কেদারনাথকে পথে পথে ঘুরিতে হইল,—কখনও কেরাণীগিরি কখনও নকলনবিশি, কখনও অন্যান্য সামান্য কাজ করিয়া কেদার নিজের পরিবার প্রতিপালন

করিতে লাগিল, কিন্তু অল্পদিনে কেদার ভয়ানক মাতাল হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়া কেহই তাহাকে বিশ্বাস করেনা। একদিন অল্প মদ খাইয়া বাড়ীতে আসিয়া নিজের দুর্ভাবনা ভাবিতেছিল, তখন তাহার ২টী মেয়ে হইয়াছে, কিন্তু কষ্টে অত্যাচারে বাপ মা মরিয়া গিয়াছে। কেদার ভাবিতে ভাবিতে অন্ধকার দেখিতে লাগিল, এবং মদ খাইয়া সমস্ত দুঃখ ভুলিয়া যাইবে বলিয়া প্রায় আধবোতল মদ খাইল। পরদিন প্রাতে তাহার স্ত্রী উঠিয়া দেখিল কেদার মরিয়া রহিয়াছে। তখন তাহার স্ত্রীর ক্লেশ কে দেখে! ত্রিসংসারে সেই অভাগিনীর আপনার জন কেহ ছিলনা, দুঃখিনী কোথায় যায়? তবুও অনেকদিন কষ্টে স্বষ্টে গেল। কিন্তু আর চলে না! অবশেষে নিরাশায় পূর্ণ হইয়া সে দুটী মেয়েকে সঙ্গে লইয়া ঘরের বাহির হইল। তোমরা দেখ মদে কি সর্ব্বনাশ করিল! ওই দেখ আজ একটী স্ত্রীলোক পথের ভিখারিণী হইল। ছল ছল চক্ষে, মলিন মুখে, দুটী মেয়েকে সঙ্গে করিয়া কেদারের স্ত্রী দেশে দেশে গৃহস্থের বাড়ীতে যায় এবং বলে "ভিক্ষা দেও গো।"

আহা! উহাকে দয়াকর। মাতালের স্ত্রীকে দয়া কর, এবং মদে কি সর্ব্বনাশ করিতেছে, তাহা ভাবিয়া মদকে ঘৃণা করিতে শেখ।

বিবিধ সংবাদ।

বিগত ১লা ডিসেম্বার শনিবার বড় লাট লর্ড রিপণ কলিকাতায় আইসেন। তাহাকে দেখিবার জন্য রেলের ঘরের নিকটে প্রায় ৫০,০০০ লোকের ভিড় হয়। কেহ বাদ্য বাজাইয়াছিল, কেহ নিশান উড়াইয়াছিল, কেহবা রাশি রাশি ফুল ছড়াইয়াছিল। আমরা বড় লাট সাহেবকে বড় ভাল বাসি, কারণ তিনি যাহে আমাদের উপকার হয় এই চান।

৩রা ডিসেম্বর, সোমবার মহারাণীর তৃতীয় পুত্র ডিউক অভ্ কনাট তাঁহার স্ত্রীকে লইয়া কলিকাতায় আসিযাছিলেন। তাঁহার আসাতে সহরের সকলেই আনন্দিত হইয়াছেন। তিনি যতদিন কলিকাতায ছিলেন, তাহার শেষ দিনে খুব আলো দেওয়া হয এবং নানা রকমের বাজি পোড়ান হয়। এক খানি খবরের কাগজের সম্পাদক বলেন "বাজি না পোড়াইয়া, খুব ঘটা করিয়া গরিব দুঃখীদিগকে খাওয়াইলে বা তাহাদিগকে কাপড় দিলে ভাল হইত।"

আজ কাল চারি দিকেই তামাক খাওয়া ও মদ খাওয়ার বিরুদ্ধে সভা হইতেছে। শুনিলাম সংপ্রতি কোড়কদি গ্রামে এইরূপ একটী সভা হইযাছে। তথাকার যুবকদিগের সকলেরই এই সভাতে যোগ দেওয়া উচিত। নেশা একেবারে ছাড়িয়া দিয়া প্রতিজ্ঞাপত্রে নাম সহি করিলেই তো আপদ চুকিয়া যাইতে পারে। হঠাৎ ছাড়িযা দিলে অভ্যাসের জন্য প্রথম প্রথম একটু কষ্ট হইতে পারে বটে, কিন্তু শেষে বেশ সহ্য হইয়া যায়। এইরূপে অনেক বড় বড় মাতাল ভাল হইযাছে, যাঁরা তামাক খান, তাঁরাতো দূরের কথা। যদি বাস্তবিক মনে প্রতিজ্ঞা জন্মে তাহা হইলে কার সাধ্য আমাকে লোভে ফেলে?

কয়েক মাস গত হইল, ইংলণ্ডের কোন এক যায়গায একজন লোক এক বোতল মদের জন্য তাহার স্ত্রীকে বিক্রয় করে। স্ত্রীও সেই দ্বিতীয় লোকটীকে বিবাহ করে। জজ সাহেব জানিতে পারিয়া স্ত্রীলোকটীকে সাজা দিয়াছেন এবং দ্বিতীয়বারের বিবাহটী ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। কি লজ্জার কথা! মাতাল হইলে কি আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে? ছি! ছি! ছি!

কলিকাতার অন্তর্জাতিক প্রদর্শনী গত ৪ঠা ডিসেম্বার মঙ্গলবার হইতে খুলিয়াছে। যতগুলি অঙ্গন বা ঘর, এক এক দেশের দ্রব্যে সাজান হইয়াছে, তাহার মধ্যে ভারত-অঙ্গন অর্থাৎ যে ঘরে আমাদের দেশের দ্রব্যজাত আছে, তাহাই সব চেয়ে ভাল বোধ হয়।

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাইতেছি যে এই এক বৎসরের মধ্যে 'সখা'র একজন বালিকা পাঠিকা এবং একজন বালক পাঠকের মৃত্যু হইয়াছে। বালিকার নাম শ্রীমতী আশালতা এবং বালকের নাম শ্রীমান জ্যোতিশ্চন্দ্র মিত্র। ছেলেটী যে 'সখা' অতি যত্নের সহিত পড়িতেন, তাহার অনেক প্রমাণ আমরা পাইয়াছি। বাঁচিয়া থাকিলে ইহাঁরা নিশ্চয়ই 'সখা'র দ্বারা নানারূপে উপকার পাইতেন। ঈশ্বরের ধন ঈশ্বর লইয়াছেন, তাহার উপরে আর কি বলিব!

মদে অনেক অনিষ্ট করিতেছে, তা'তে আবার খোলা ভাঁটী হইয়া সব দিকে মদ সস্তা হওয়াতে আরও ক্ষতি হইতেছে। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, আমাদের বাঙ্গালা দেশের ছোট লাট সাহেব কয়েকজন সাহেব এবং বাঙ্গালী লইয়া একটী কমিশন বা সভা করিয়াছেন; তাঁহারা দেশে বিদেশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কোথায় মদে কিরূপ অপকার হইতেছে, তাহা দেখিবেন। ইহাঁরা সম্প্রতি বেহার অঞ্চলে গিয়াছেন। দেখা যাউক, ইহাঁদের চেষ্টায় মদের তেজ একটু কমে কি না।

নীচের লিখিত ঔষধগুলির কথা এক খানি কাগজে বাহির হইয়াছে:—

শিশুদিগের জ্বরের মহৌষধ।—পাঁচ বৎসরের কম বয়স্ক শিশুদিগের জ্বর হইলে এইরূপ ঔষধ বিশেষ কার্য্যকারী হইবে;—অর্দ্ধাঙ্গুলি পরিমাণ মানকচুর সরু সরু সাদা শিকড় লইয়া আড়াই খানি গোল মরিচের সহিত বাটিয়া খাওয়াইতে হইবে। ইহা প্রতিদিন একবার করিয়া সেবন করাইলে তিন চারিদিনের মধ্যে জ্বর ভাল হইয়া যায়।

কাশি।—শিশুদিগের কাশি হইলে পাতলা সিঁসির গুঁড়ো (ধূলির ন্যায় সরু) কিঞ্চিৎ মধু অঙ্গুলি করিয়া লইয়া প্রত্যহ জিহ্বায় ঠেকাইয়া দিলেই তিন চারিদিনের মধ্যে কাশি ভাল হইয়া যায়।

পিপীলিকানিবারক।—যে সকল খাদ্য দ্রব্যে সচরাচর পিপীলিকা ধরিয়া থাকে, তাহার সহিত কিঞ্চিৎ কর্পূর ফেলিয়া রাখিলে পিপীলিকা আর সে সকল খাদ্যদ্রব্যের নিকট আসিতে পারে না।

পিপীলিকা, বোলতা ও ভিমরুল কামড়াইলে গোময় দ্বারা দষ্ট স্থান আবদ্ধ করিলে আরোগ্য হয়।

কৃমিনাশক।—আনারসের পাতার এক ছটাক আন্দাজ রস অল্প পরিমাণ চূনের জলের * সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে কৃমি একেবারে বিনষ্ট হয়।

শাল রেশমী ও পশমী কাপড়ের সহিত কালজিরা ও মাথাঘসার সহিত যে পচা পাতা ব্যবহৃত হয়, সেই পচা পাতা রাখিলে উক্ত সকল প্রকার বস্ত্র পোকায় কাটিতে পারে না।

ধাঁধা।

১। তিনটী জেলের মেয়ে কচ্ছপের ডিম লইয়া বাজারে বিক্রয় করিতে গেল; একজন ৫০, দ্বিতীয়

* একটা বোতলে খানিকটা চূন এবং জল একসঙ্গে ঝাঁকড়াইয়া কিছুকাল রাখিয়া দিলে চূনটা তলায় পড়িয়া থিতিয়া উপরে যে জল থাকে তাহাকেই চূনের জল বলে। ইহাই আস্তে আস্তে ঢ দিয়া ছাঁকিয়া লইতে হয়।

জন ৩০, এবং তৃতীয় জন মোটে ১০টী লইয়া গেল। প্রথমে, ডিমের যে দর ছিল, তাহার পর তাহা অপেক্ষা অনেক চড়িয়া গেল। সকলেই এক দরে বিক্রয় করিল; যখন বাজার নরম ছিল, তখন নরম দরে এবং যখন চড়া হইল, তখন চড়া দরে, এইরূপে দুইদরে তাহাদের সমস্ত বিক্রয় হইল।—ঘরে ফিরিয়া যাইবার সময় তাহারা দেখে সকলের সমান পয়সা হইয়াছে। কেমন করিয়া হইল বল দেখি?

২। দুটী অক্ষরে আমার নাম, শুনিলে মনে হয় আমাকে দেখা যায় না, অথচ দিনরাত খোলা থাকি, আমি একটী সহর। আমার ঘরে অনেক মুসলমান বাস করে; আমার স্কুল কালেজে অনেক ছেলে মানুষ হয়, বলত আমি কে?

৩। বলত কোন্ পশুর গলা কাটিয়া একটু না দিলেই, দিব্য একটী বাচ্ছা হয়?

৪। একটী ছোটো গোয়ালের মধ্যে দুটী গরু বাঁধা, একটী পূর্ব্ব দিকে, আর একটী পশ্চিম দিকে। ছোট ঘর, ঘুরাইয়া বাঁধিবার যো নাই। এখন বল দেখি কোন্ যায়গায় খড় রাখিলে দুটো গরু-তেই খেতে পাবে?

কে মজা কোরবে?

বোতলের ভিতর হাঁসের ডিম, বাহবা বাহবা!!"

একটা মুখ সরু বোতল আন৹ তাহার ভিতরে খানিক জল রাখ। তার পর হাঁসের ডিমটী একটা পাত্রে সির্কেতে* ভিজাইয়া খানিক রাখ, পরে যখন দেখিবে ডিমটী বেশ নরম হইয়াছে তখন আস্তে আস্তে লইয়া "দেখো বাবু! দেখো বাবু!" বলিয়া সেই বোতলের মুখ দিয়া ঠেলিয়া দাও। জলে পড়ি-লেই ডিম আবার কঠিন হইবে; তখন জল ফেলিয়া দিয়া বলিবে "বোতলের ভিতর আস্তো ডিম! বাহবা বাহবা।"

"একটা পাতায় কুড়িটী গাছ, বাহবা বাহবা!!"

(২) একটা বড় পাতরকুচী পাতা সুতাতে বাঁধিয়া ঘরের খড়খড়ীতে টাঙ্গাইয়া রাখ, দিন কতক পরে পাতাটীর সর্ব্বাঙ্গে প্রায় ২০। ২৫ টী চারাগাছ বাহির হইবে, তখন তাহাকে লইয়া সকলকে দেখাইবে। "একটা পাতায় ২০ টী গাছ, বাহবা বাহবা!!" কেমন?

"ছাইএর সুতায় আংটী ঝোলে, বাহবা বাহবা!!

(৩) এক গাছি সুতাতে একটী ছোট আংটী বাঁধিবে। ঠিক স্থির হইলে পর তাহাতে একটী দেশলাই ধরাইয়া দিবে; আস্তে আস্তে পুড়িয়া ভস্ম হইয়া যাইবে, তথাপি আংটী ঝুলিবে। সুতাটী কিন্তু পূর্ব্বে খুব লবণ-গোলা জলে ভিজাইয়া পরে শুষ্ক করিয়া রাখিতে হইবে। দেখিয়া সকলে অবাক্ হইলে, তুমি বলিবে "ছাইএর সুতোয় আংটী দোলে বাহবা বাহবা"। কেমন?

বিজ্ঞাপন।

গত বৎসরে যাঁহারা 'সখা'র গ্রাহক ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা পাঠাইতে বারণ করেন নাই, তাঁহাদের সকলেরই নিকট নূতন বৎসরের প্রথম সংখ্যা পাঠান গেল। যাঁহারা জানুয়ারি মাসের মধ্যে মূল্য না পাঠাইবেন বা মূল্যের সম্বন্ধে পত্র না

---

* সিরকা বা ভিনিগার ডাক্তারি ঔষধের দোকানে পাওয়া যায়।

লিখিবেন, অথবা যাঁহাদের নিকট হইতে 'সখা' ফিরিয়া আসিবে, তাঁহাদের নিকট আর 'সখা' পাঠান যাইবে না।

কেহ কেহ এজেন্ট হইতে ইচ্ছা করিয়াছেন। অপরিচিত স্থলে অগ্রিম মূল্য জমা না রাখিলে, আমরা কাহাকেও এজেন্ট করিতে পারিনা। এজেন্টদিগের সম্বন্ধে নিয়ম এই যে, যিনি ১০ খণ্ড বিক্রয় করিয়া দিতে পারিবেন, তাঁহাকে একখণ্ড বিনা মূল্যে দেওয়া যাইবে, টাকা লইতে ইচ্ছা করিলে ঐ হিসাবে টাকা দেওয়া যাইতে পারে।

সখা-কার্য্যাধ্যক্ষ।

আমাদিগের আগামী বর্ষের পুরস্কার।

গত বৎসরে ধাঁধার জন্য শ্রীমতী অলকাসুন্দরী রায়ের একটী পুরস্কার এবং চিত্রের জন্য আমাদের একটী পুরস্কার ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় গত বৎসরে কেহই ঐ দুটী পুরস্কারের উপযুক্ত হন নাই সুতরাং এবৎসরেও ঐদুটী পুরস্কার দেওয়া যাইবে। ইহা ছাড়া, আমরা আরও কতকগুলি পুরস্কার দিতে ইচ্ছা করিয়াছি, সমস্ত পুরস্কারের খবর আগামী মাসে প্রকাশ করিব।

সখা-কার্য্যাধ্যক্ষ

সখা-সংক্রান্ত নিয়মাবলী।

১। সখার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কলিকাতা ও মফঃস্বলে এক টাকা মাত্র। প্রতি খণ্ডের নগদ মূল্য /১০ মাত্র। পোষ্টাল নোট, মণিঅর্ডার বা অর্দ্ধ আনার ডাকটিকিটে, "সখা কার্য্যাধ্যক্ষ" এই নামে সখার মূল্যাদি পাঠাইতে হইবে। ডাকটিকিটে মূল্য পাঠাইলে প্রত্যেক টাকায় কমিশন বলিয়া /০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

২। পত্রিকাস্থ চিত্রের সংখ্যা কিছুই নির্দ্দিষ্ট থাকিবে না, তবে প্রত্যেক সংখ্যায় যাহাতে অন্ততঃ এক খানি চিত্র থাকে আমরা সেদিকে দৃষ্টি রাখিব।

৩। বালকবালিকাদিগের রচনা উৎকৃষ্ট হইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইবে; তবে সুদীর্ঘ হইলে প্রকাশিত হইবে না।

৪। শিক্ষক এবং অভিভাবকদিগের পরামর্শ প্রভৃতি সাদরে গৃহীত হইবে।

৫। বালকবালিকাদিগের উপকারে আসিতে পারে, কেহ এরূপ কোন রচনা বা কোন সংবাদ কিম্বা সত্য ঘটনার বিশেষ বিবরণ আমাদিগের নিকট পাঠাইলে আমরা তাহা সাদরে প্রকাশ করিব।

৬। সখা-সংক্রান্ত সমস্ত পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে। কেবল রচনা, পরামর্শ প্রভৃতি সম্পাদকের নামে কার্য্যালয়ের ঠিকানায় পাঠান আবশ্যক।

৭। ধাঁধার উত্তর, আলোচনার বিষয়, বা সখায় প্রকাশ করিবার জন্য পত্র প্রভৃতি, পূর্ব্বের মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে আমাদিগের কার্য্যালয়ে পৌঁছা আবশ্যক।

৮। ঠিকানার পরিবর্ত্তন, তিন মাসের কম সময়ের জন্য হইলে, তাহা করা যাইবে না; অল্প সময়ের জন্য হইলে গ্রাহকগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্থানীয় ডাকঘরের সহিত পরিবর্ত্তনের বন্দোবস্ত করিবেন।

"সখা" কার্য্যালয়,
৫০ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট।
কলিকাতা।

শ্রীঅন্নদাচরণ সেন।
"সখা" কার্য্যাধ্যক্ষ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিতএবং ৫০নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, "সখা" কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

দ্বিতীয় ভাগ। ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৪। ২য় সংখ্যা।

কার জিৎ।

অক্রোধেন-জয়েৎ ক্রোধম্-অসাধুংসাধুনাজয়েৎ।
জয়েৎ কদর্য্যং দানেন-জয়েৎ সত্যেন চানৃতম্॥

ক্ষমার দ্বারা ক্রোধকে জয় করিবেক, সাধুতাদ্বারা অসাধুতাকে জয় করিবেক, উপকার দ্বারা অপকারীকে জয় করিবেক, এবং সত্য দ্বারা মিথ্যাকে জয় করিবেক।

রায়পুরের বাগানটির বড় শোভা হইয়াছে। গাছে গাছে লতা উঠিয়াছে, পাতায় পাতায় বিকালবেলার সূর্য্যের সোনার কিরণ ঝিকমিক করিতেছে, বকুল ও সিউলির তলায় ফুলের তারা ফুটিতে আরম্ভ হইয়াছে। বাগানের মাঝে মাঝে দুর্ব্বাদলের ঘন বনগুলি ছোট ছোট ছেলে মেয়েদিগের জন্য বিছানা পাতিয়াছে। রায়পুরের যত বালিকা এ সময় এখানে খেলিতে আসিয়াছে। কেহবা ফুল গাছের তলায় ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে।

ঐখানে একটি বকুল গাছের তলায়—অমলা ও বিমলা ফুল কুড়াইতে মত্ত। টুপটাপ করিয়া একবার এখানে, একবার ওখানে, একবার অমলার মাথায়, একবার বিমলার গায়ে ফুল পড়িতেছে। তাহারা একটি তুলিতে গিয়া একটি মাড়াইতেছে, কতকগুলি আঁচলে রাখিবার সময় কতকগুলি ফেলিয়া দিতেছে।

ফুল আঁচলে রাখিতে বিমলা একবার উঠিয়া দাঁড়াইল, বুঝি তখন কাহাকে এইদিকে আসিতে দেখিল, সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল—"ওলো অমি, ঐদিকে চল ভাই, ঐ আসছে।" অমির ভয়ে আঁচল হইতে ফুল পড়িয়া গেল, আর পা সরিলনা, থতমত খাইয়া দাঁড়াইল।

দেখিতে দেখিতে লক্ষ্মী আসিয়া উপস্থিত হইল। লক্ষ্মী অন্য বালিকাদের প্রতি বড় অত্যাচার করিত। সেই জন্য তাহাকে সকলে ভয় করে, তাহাকে সকলে যম মনে করে। কিন্তু লক্ষ্মীর পিতা গ্রামের মধ্যে ধনী সেই জন্য লক্ষ্মী যাহা ইচ্ছা করিলেও অন্য কেহ কথা কহিতে সাহস করে না। লক্ষ্মীও দেখে সে যাহাই করুক কিছুতেই তাহার শাস্তি হয় না, সে নির্ভয়ে যাহা ইচ্ছা, করে।

লক্ষ্মী আসিয়া মুখ বেঁকাইয়া, চোক রাঙ্গা করিয়া, অমলার হাত ধরিয়া হড় হড় করিয়া টানিতে টানিতে বিমলাকে বলিল "হ্যালা বিমলি, তোদের কি বুকের পাটা? সে দিন বারণ করেছি এগাছের তলায় তোরা কেউ ফুল কুড়াবি নে, আবার এসেছিস? এবার এখানে দেখ্‌তে পেলে হাড় ভেঙ্গে দেব।" অমলা ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিল, বিমলা আস্তে

আস্তে অমলার হাত ধরিয়া চলিয়া গেল। লক্ষ্মী তাহাদের আঁচলের ফুল আপনার আঁচলে লইয়া চারিদিকে ছড়াইতে ছড়াইতে যেখানে কিছু দূরে কয়েকটি বালিকা ঘুটিম খেলিতেছিল সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইল। লক্ষ্মীকে দেখিয়া বালিকাগুলি একটু ভয়ে ভয়ে খেলিতে লাগিল।

লক্ষ্মী বলিল "আমি খেলিব।" একজন আস্তে আস্তে বলিল "এ হাতটা আগে হার জিৎ হোক।" লক্ষ্মীর রাগ হইল, সে বলিল "কি আমাকে লইয়া খেলিবিনে? দেখিব তোদের এহাত কে খেলিতে দেয়" বলিয়া সমস্ত ঘুটি গুলি চারি দিকে ফেলিয়া দিয়া রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে চলিয়া গেল। সে মুখ ফিরাইবা মাত্র তাহার পৃষ্ঠ দেশ লক্ষ্য করিয়া মারিবার ছলে সকল বালিকারা হাত উঠাইয়া আস্তে আস্তে গালি দিতে লাগিল, তাহার সাক্ষাতে ত ভয়ে কিছু বলিতে পারেনা, কাজেই সকলে তাহার পশ্চাতে এইরূপ শোধ তুলিয়া থাকে।

লক্ষ্মী সেখান হইতে চলিয়া আসিয়া দেখিল কুসুম কুলগাছ হইতে কুল পাড়িতেছে। লক্ষ্মী একে রাগিয়া আছে, কুল পাড়িতে দেখিয়া জ্বলিয়া উঠিল, লক্ষ্মী জানে সেই বাগানের ফল লক্ষ্মী ভিন্ন আর কাহারো পাড়িবার অধিকার নাই, কিছু না কহিয়া না বলিয়া তাড়াতাড়ি আসিয়াই লক্ষ্মী কুসুমকে এক চড় বসাইয়া দিল, কিন্তু চড় মারিয়া হাত সরাইয়া লইবার সময় তাহার হাতটি সেই কুলগাছের শাখায় পড়িয়া, কাঁটায় বিঁধিয়া ঝর ঝর করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল।

কুসুমের প্রাণে তাহাতে বড় বেদনা লাগিল, লক্ষ্মী যে তাহাকে মারিয়াছে, লক্ষ্মী যে তাহার প্রতি অত্যাচার করে সে তাহা ভুলিয়া গেল। কাছে পুষ্করিণী, কাঁদ কাঁদ চোখে কুসুম লক্ষ্মীকে ধরিয়া তাহার তীরে আনিয়া বসাইল, তাহার পর আপনার আঁচল ছিঁড়িয়া তাহা ভিজাইয়া তাহার হাতে বাঁধিয়া তাহাতে বার বার জল দিতে লাগিল।

লক্ষ্মী কাহারো নিকট এরূপ প্রতিশোধ পায় নাই,—লজ্জায়, অনুতাপে সে মরিয়া গেল। কুসুমের ব্যবহারে তাহার হৃদয়ের একটি লুকান তারে আঘাত লাগিল, এত দিন তাহা কেহ জাগাইতে পারে নাই। অনেকক্ষণ পরে লক্ষ্মী বলিল "কুসুম আজ তুমি আমাকে যাহা শিক্ষা দিলে এ পর্য্যন্ত তাহা আমাকে কেহ শিখায় নাই। তোমার ঐ উপকার আমি জন্মে ভুলিব না, এই কথা মনে করিয়া আমি তোমার মত হইতে চেষ্টা করিব।" সেই পর্য্যন্ত লক্ষ্মী একেবারে বদলাইয়া গেল, আর লক্ষ্মীকে কাহারো প্রতি অত্যাচার করিতে দেখা যায় না। যখনি অভ্যাস বশতঃ লক্ষ্মী কাহাকেও মারিতে যায় অমনি সেই দিন কার ঘটনাটি মনে পড়ে, অমনি তাহার মনে অনুতাপ জাগিয়া উঠে, অন্যায় কর্ম্ম হইতে বিরত হইতে বল পায়, কুসুমের মত ভাল হইতে সংকল্প করে।

এইরূপ প্রতি মন্দ কাজে কুসুমের ছবি আসিয়া তাহাকে তাহা হইতে সরাইয়া দিতে লাগিল, লক্ষ্মী ক্রমে যথার্থ লক্ষ্মী হইয়া দাঁড়াইল।

* * * *

* * * *

ইহার পর কতদিন চলিয়া গিয়াছে, লক্ষ্মীর এখন বিবাহ হইয়া গিয়াছে। কতদিন পরে লক্ষ্মী শ্বশুরালয় হইতে পিত্রালয়ে আসিয়াছে। লক্ষ্মী এখন সকলকে ভাল বাসিতে শিখিয়াছে, লক্ষ্মীকেও এখন সকলে ভাল বাসে। লক্ষ্মীর আগেকার যত সমবয়সী সকলেই তাহাকে দেখিতে আসিয়াছে, কেবল কুসুম আসে নাই। কুসুম কোথায়? কুসুম বুঝি এপৃথিবীর মেয়ে নয়, স্বর্গে ফুটিতে গিয়াছে!

লক্ষ্মী বিকালে সেই ছেলেবেলার বাগানটিতে আসিল, বাগানের চারিদিকে বিষণ্ণ মনে ঘুরিয়া ঘুরিয়া চাহিয়া দেখিল। ছেলেবেলা যেখানে যে গাছ গুলি দেখিয়াছিল সকলি তেমনি দেখিল, ছেলেবেলা যেখানে যার সহিত যেমন করিয়া খেলা করি-

যাছিল, সকলেরি চিহ্ন যেন দেখিতে পাইল। লক্ষ্মী আস্তে আস্তে সেই কুল গাছটির তলায় আসিয়া দাঁড়াইল,—এইখানেই তাহার জীবনের প্রথম শিক্ষা। লক্ষ্মী সেখান হইতে সেই পুকুর ধারে আসিয়া দাঁড়াইল,—এইখানে কত যত্ন করিয়া কুসুম তাহার আহত হাতি বাঁধিয়া দিয়াছিল, কিরূপ প্রতিশোধ দিয়া লক্ষ্মীকে সে ভাল করিয়াছে! অশ্রুজলে লক্ষ্মীর বুক ভাসিয়া গেল। লক্ষ্মী মনে মনে বলিল "কুসুম কোথায় তুমি! তোমাকে আর পৃথিবীতে দেখিতে পাইলাম না, তুমি এখন স্বর্গের দেবী,—কিন্তু লক্ষ্মীর হৃদয়ে তুমি চিরকালি ফুটিয়া থাকিবে।"

সুশীলা ও তাহার মা।

শীলার মা আজ পীড়িতা হইয়া শয্যায় শুইয়া আছেন, সুশীলা মার কাছে বসিয়া রহিয়াছে; তাহার আর জগতে কেহ নাই, কেবল তাহাদের দুঃখে দুঃখী যাদুমাসীই মধ্যে মধ্যে তাহাদের দেখিতে আসেন ও সাহায্য করেন। সমস্ত দিন বালিকার আহার হয় নাই, কিন্তু তাহাতে তাহার কোন কষ্ট বোধ হইতেছে না, মার অসুখে আর জগতে অন্য সুখ সে জানে না। এত রাত্রি হইয়াছে বালিকার চক্ষে নিদ্রা নাই, মা কতবার বলিতেছেন, সে শুনিতেছে না, সুশীলা চুপ করিয়া মার মাথায় হাত বুলাইতেছে ও ভাবিতেছে। আহা! জগৎ-শুদ্ধ লোক আনন্দমনে নিদ্রা যাইতেছে, সুশীলার নিদ্রা নাই, ক্ষুধা নাই। যে, দিনে রাত্রিতে তিন বার আহার করিত সেই নবম-বর্ষীয়া বালিকার আজ সমস্ত দিন আহার হয় নাই। সুশীলা অনেকক্ষণ পরে "ফোঁস" করিয়া একটা নিশ্বাস ত্যাগ করিল। মা আর সহ্য করিতে পারিলেন না। বলিলেন, "হা ঈশ্বর! বাছা আমার আহার নিদ্রাতেও বঞ্চিত হইল? তা মা তুমি তোমার মাসীর নিকট চাট্টী খেয়ে এলে না কেন?"

সুঃ—"না মা আমি খাওয়ার জন্য ভাবিতেছি না, তুমি এই যে প্রায় দুদিন কিছু খাওনি, মা?" জননী জিজ্ঞাসা করিলেন "তবে তুমি কি ভাবিতেছ?" "আমি ভাবিতেছি যে, তুমি বলিয়াছ, পরমেশ্বর পরম দয়ালু, আরও তুমি যে বলিতে তিনিই আমাদের সহায়? তা' মা! তিনি কেন আমাদের এমন কষ্টে ফেলেন? এই দেখ, কত লোকের কত আছে; দাদা, মামা, কাকা, বাবা, ঘোড়া, গাড়ী, চাকর, দাসী, তাত আমাদের নাইই। তুমি আমার ছিলে আমরা সমস্ত দিন একত্রে থাকিতাম, তাহাতেও কত সুখী ছিলাম, এতেও তিনি কেন বাধা দিলেন? তোমার আবার জ্বর হইল কেন? হাঁ মা! তুমি ত অনেক কথা আমায় বুঝাইয়া দিয়াছ, এবার কিন্তু এইটী বলিতে হইবে, আমাদের অসুখ হয় কেন? তিনি ত যাহা করেন সমস্তই আমাদের মঙ্গলের জন্য। আচ্ছা রোগ কি আমাদের মঙ্গলের জন্য? তা যদি না হয়, তবে দয়ালু পরমেশ্বর কেন মানুষকে রোগ দিয়াছেন।"

ব্যামোয় পড়েও মার মুখ যেন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, কন্যার মুখে ঈশ্বরের কথা শুনিয়া তিনি রোগের জ্বালা ভুলিয়া গেলেন, প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় সুশীলাকে আজ আর একটী নূতন কথা শিক্ষা দিবেন এই আনন্দে তাঁহার শুষ্ক মুখ প্রফুল্ল হইল, তিনি ধীরে ধীরে দেয়াল ঠেষ দিয়া বসিলেন ও বলিতে লাগিলেন ঃ—"পরমেশ্বর যথার্থই মঙ্গলময়, মঙ্গল ভিন্ন আর কিছুই তাঁহার নিকট হইতে আসে না। অনেক লোক আছে তাহারা মৃত্যু, রোগ, শোক প্রভৃতি দেখিয়া তাঁহার নিন্দা করে ও তাঁহাকে অবিশ্বাস করিতে চায়। কিন্তু বুঝিয়া দেখে না যে তাহারা যাহাকে অমঙ্গল মনে করে পৃথিবীতে তাহাতে কত মঙ্গল হয়, এবং তাহারা যাহাকে সুখ বলে তাহাই পৃথিবীতে কত অনিষ্ট করে। ধনী মানুষেরা সুখী, কিন্তু তাহাদের চরিত্রের যে কত দোষ তাহা দেখে না। সুখ বা

দুঃখ কিছুই আমি বুঝি না; সুখ হয় হউক, দুঃখ পাই ভাল, কিছুতেই আমার ক্ষতি বোধ হয় না। এই তোমার কচি মুখখানি দেখিতেছি, তাহাতেও যেরূপ আমার আহ্লাদ হয়, আমি মরিয়া গেলে আর দেখিতে পাইব না তাহাতেও দুঃখ নাই। পরমেশ্বর যাহা দিয়াছেন ভোগ করিব; যাহা দেন নাই তাহার জন্য কেন দুঃখ করিব? বরং যাহা দিয়াছেন তাহার জন্য তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। সুখ দুঃখ কিছু মানুষের সৌভাগ্য দুর্ভাগ্যের কারণ নয়, কিন্তু সততা ও অসততাতেই মানুষের ভাগ্যের পরীক্ষা। ঘোর দুঃখীও যদি ঈশ্বর-ভক্ত হয় ও তাঁহার নাম করে, তবে সেও মহৎ লোক, আবার লাখ টাকা পুঁজি করে, চারিতলা বাড়ীতে যে ব্যক্তি সুখে আছে, সেও যদি পাপী ও ঈশ্বরে অবিশ্বাসী হয় এবং তাঁহাকে না ডাকে, তবে সেও অতি নীচ ও হতভাগ্য। তুমি ত জান মা! যে সমস্ত বস্তুই মিথ্যা, কোন দ্রব্যই চিরস্থায়ী নয়,— সুতরাং তুচ্ছ বস্তুতে কেহ কি সুখী হইতে পারে? দিনকতক মিথ্যা বস্তুতে সুখী হইয়া পরে চিরকাল কষ্ট পাওয়া অপেক্ষা, এ জীবনে সাংসারিক ক্লেশ পাইয়া যদি পরকালে সুখ পাওয়া যায় সে ত খুবই ভাল। এই জন্যই এত কষ্টেও আমার কষ্ট বোধ হয় না, তোমার মুখ দেখিয়া কত খুসী হই, আর ঈশ্বরকে সর্ব্বদা চিন্তা করিয়াই পরম আনন্দ লাভ করি।

"রোগে কষ্ট হয় সত্য, সাংসারিক ক্লেশেও দুঃখ হয় বটে, কিন্তু এত প্রকৃতিরই নিয়ম, সকলেই সমান হইতে পারে না, কেহ দুঃখী কেহ সুখী হইবেই। আরও যদি স্থির হইয়া বুঝা যায়, তাহা হইলে জানিতে পারি যে ইহাদের মধ্যেও মঙ্গল রহিয়াছে। মনে কর জগতে দুঃখ নাই, রোগ নাই; তাহা হইলে কি কেহ ধার্ম্মিক হইত? সকলেই সুখে মত্ত হইয়া দিন কাটাইত। ঈশ্বর, ধর্ম্ম, পুণ্য, সৎকর্ম্ম প্রভৃতির বিষয় চিন্তাও করিত না। কিন্তু এখন যে কষ্টে পড়ে, রোগে শয্যাগত হয়, সে অসহায় অবস্থায় ঈশ্বরকে সহায় ভাবিয়া ধার্ম্মিক হইতে চেষ্টা পায়, সুস্থ অবস্থায় কত অন্যায়, কত পাপ করিয়াছে তাহা মনে হইয়া অনুতাপ করে, এবং ভবিষ্যতে আর কুকার্য্য করিবে না স্থির করে। দেখদেখি রোগ কেমন দরকারী? এই মাত্র যে যুবা রূপ, যৌবন, বল, ধন-মান প্রভৃতির অহঙ্কারে পৃথিবীকে সরা জ্ঞান করিয়া মদ্যপানে ও অন্যায় কাজে জীবন নষ্ট করিতেছিল, হঠাৎ কুকর্ম্মের ফলে একটা উৎকট পীড়া আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল,—সেই গৌরবর্ণ শরীরটা মলিন হইয়া গেল, সেই বলশালী হাত দুখানি এখন আর নড়িতে পারে না, সেই অহঙ্কৃত যুবা আর এখন সেরূপ নাই। সে এবার বেশ শিক্ষা পাইয়াছে। এই অবধি প্রতিজ্ঞা করিল যে অন্যায় আর করিবে না, কারণ ঈশ্বর বৈ আর জীবের গতি নাই। সে একজন ধার্ম্মিক সচ্চরিত্র লোক হইয়া উঠিল। কি চমৎকার ক্ষমতা রোগের? সংসার ও টাকাকড়ি বা বড়মানুষির আমোদ যে বৃথা ও কিছুই নয় একথাটী শিক্ষা দিতে এমন আর কি আছে? চারিদিকে ধুমধাম, আহ্লাদ আমোদ, হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দ, তার মধ্যে যখন একটী রোগীকে দেখিতে পাই, তখনই মনে হয় এ পৃথিবীতে এরূপ সুখে, এরূপ সুস্থ শরীরে চিরকাল থাকিব না, কাজেই ধর্ম্মের দিকে, ঈশ্বরের দিকে মন আপনিই ছুটিয়া যায়। রোগ শোকে মানুষকে বিশুদ্ধ করে, যেমন সোণা অগ্নিতে পড়িলে তবে বিশুদ্ধ হয়, মানুষও তেমনি দুঃখে না পড়িলে সাধু ধার্ম্মিক হইতে পায় না। দেখ দেখি দুঃখ, রোগ, শোক মানুষের কত মঙ্গলদায়ক।"

বুদ্ধিমতী বালিকা স্থির মনে সমস্ত শুনিল, সমস্ত বুঝিল পরে বলিল "ভাল মা, যাহারা পাপ ও ও মন্দ কর্ম্ম করে, তাহারাই তবে কেন রোগে পড়ে না, তোমার মত লোক, যারা রাত্রিদিন পরমেশ্বরকে ডাকে, ধর্ম্ম বৈ জানে না, তাহারা কেন কষ্ট পায়?

তাহারা কেন রোগে পড়ে?" জননী সস্নেহে ক্ষণেক বালিকাব মুখখানি দেখিয়া, একটী চুম্বন কবিয়া বলিলেন "মা! জগদীশ্বর যে মহান্, অবোধ্য, অসীম, তাঁহাব বুদ্ধিব কথা প্রকাশ করি এমন সাধ্য আমাব কৈ! কিন্তু যতটুকু জানি তোমায় বলিব। বোগ, শোক যখন মানুষকে পবিত্র করিবার জন্যই, তখন ধার্ম্মিক লোকেবাই বা কেন বোগে পড়িবে না? মানুষ যতই উন্নত হউক, তাহাব উন্নতিব ত আব সীমা নাই, উহা যে অশেষ। সুতবাং যতই কেন ধার্ম্মিক হও না আবও কষ্টে পড়িলে আবও ধার্ম্মিক হইতে পাবিবে। আমাব কথা বলিতেছ, আমি ত কত পাপ কবি, কত মন্দ চিন্তা মনে স্থান দিই, আমাব তঅনেক দোষ আছে যাহা দূব কবা আবশ্যক, আমাব অপেক্ষা শতগুণে উন্নত ও সাধু, যাঁহারা ভ্রমেও পাপ জানেন না, ঈশ্ববই যাঁহাদেব একমাত্র চিন্তাব স্থল, এমন ধর্ম্মগত-প্রাণ যাঁহাবা তাঁহাবাও কত কষ্টে পড়েন, বোগে কত যন্ত্রণা পান, তাহাব ইয়ত্তা নাই। তাহাব কাবণ এই যে দুঃখে তাঁহাদেবও উন্নতি হয় এবং তাঁহাদেব অবস্থা দেখিযা জগতেব লোক জানিতে পাবে, যে সুখ বা দুঃখ কিছুই নয়, অবস্থার প্রভেদ মাত্র, ধর্ম্মই সারবস্তু। আরও তাঁহাদের উজ্জল দৃষ্টান্ত দেখিযা লোকে শিক্ষা পায়, অশেষ দুঃখ যন্ত্রণাব মধ্যেও সাধু ধার্ম্মিক ব্যক্তিবা কেমন অচলভাবে ঈশ্ববকেই অবলম্বন কবিযা থাকেন ও কেমন সন্তোষের সহিত দিন কাটান;—তাহা দেখিয়া জগৎ-শুদ্ধ লোক অবাক হয়, এবং ধর্ম্মই যে মানুষের রোগে, শোকে, দুঃখে, যন্ত্রণায় একমাত্র সহায় ও সুখদাতা বন্ধু, তাহা জানিতে পারে। ধার্ম্মিক লোকের নিকট রোগ শোক যে কিছুই করিতে পারে না, তাহা শিক্ষা পায়। সুতবাং রোগ প্রভৃতি সাংসারিক অমঙ্গল সর্ব্বদাই অশেষ কল্যাণ করিয়া থাকে, ইহারা মঙ্গলময় পরমেশ্বরের ইচ্ছার ফল স্বরূপ। ইহাতে দুঃখ বোধ করিতে নাই, অসন্তুষ্ট হওয়া অন্যায। যাঁহাবা সৎ, পবিত্র, ও ঈশ্বর-বিশ্বাসী তাঁহাবা কিছুতেই কাতব হন না। মঙ্গলময় ঈশ্বর যাহা কবেন তাহাই ভাল, যে অবস্থায আমাদিগকে বাখেন সেই সুখেব অবস্থা। কেবল যদি তাঁহাকে আমরা মনে বাখিতে পাবি তাহা হইলেই ঘোব দুঃখকেও সুখ বলিযা বোধ হয। তাঁহাব প্রতি যাহাদেব ভক্তি আছে তাহারা অমূল্য ধন পাইয়াছে। কিন্তু ঈশ্ববে ভক্তি-ছাড়া হইযা কোন অবস্থাতেই সুখ নাই। তাই মা! কখনও তাঁহার কার্য্যকে মন্দ বলে সন্দেহ কবিও না। আজ এস নিদ্রা যাই।"

তৎপবে সুশীলা হাত দুটী যুড়িয়া জানু পাতিয়া মাযেব পার্শ্বে বসিল, এবং পবম করুণাময পবমেশ্ববকে ডাকিযা মাতৃপার্শ্বে শয্যায শযন কবিয়া নিদ্রা গেল। আহা! ধন্যা সেই মা, যিনি এমন কন্যারত্ন লাভ কবিযাছেন, তিনি পৃথিবীতে থাকিযাও স্বর্গবাস কবেন। ধন্যা সেই বালিকা, যে এমন মাতা পাইয়াছে, তাহাব কুড়ে ঘবও বাজার বাড়ীর মতন, এবং দুদিন না খাইলেও সে মধু খাইতেছে।

শিশু-স্বাস্থ্য-রক্ষা।

বালক বালিকাগণ, তোমাদিগকে বিবাহ সম্বন্ধে কোন কথা বলিতেই লজ্জা বোধ হয়, অথচ বলিতেই হইবে। আমাদের সমাজ এরূপ এবং অভিভাবকগণ এমন অন্ধ যে তোমাদিগকে ভিন্ন আব কাহাকেও বলিতে পাবি না।

বিবাহ কাহাকে বলে, তাহা তোমরা জাননা, কিন্তু না জানিলে কি হয়, আর কয়েক বৎসরের মধ্যে তোমাদিগেরও বিবাহিত হইতে হইবে। তোমরা চাও, আর না চাও, তোমরা জান আর

না জান, কিন্তু সমাজ তোমাদিগকে ছাড়িবে না, তোমাদিগের পায়ে বেড়ী দিবেই দিবে।

ইংরাজ দিগকে দেখিয়াছ? কেমন বলবান, সাহসী ও ধনী! কতদূর হইতে আসিয়াছে, কত অল্প লোকে তোমাদিগের এত কোটী লোকের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেছে। তোমরা এমন পারনা কেন? কারণ অল্প বয়সেই বিবাহিত হইয়া তোমরা সংসারে আবদ্ধ হইয়া পড়িবে। দারিদ্র্য ও সংসারের জ্বালায় আর উচ্চতর প্রবৃত্তি সকল থাকে না। তোমরা বিদেশে যাইতে ভয় কর, প্রাণ দিতে পার না, কারণ তোমাদের পরিজনগণের কি উপায় হইবে! তোমরা স্কুল ছাড়িলেই চাকরী লইতে হইবে, নতুবা তোমাদের সন্তানগণ উপবাস করিবে। সুতরাং এই বাল্য বিবাহই তোমাদের সকল উন্নতির কন্টক।

আবার দেখ, ঐ যুবক ১৮ বৎসর বয়সে সন্তানের পিতা হইল, উহার সন্তানের পীড়া সারিতেছে না, তাহার শরীর ও সবল হইতেছেনা—সে যদি বাঁচিয়াও থাকে, তথাপিও কোন কার্য্য করিতে পারিবে না, এবং বাঁচিবে কি না তাহাই সন্দেহ। আবার তাহার পিতাকে দেখ, শরীর কেমন রুগ্ন, পড়া শুনা হইলনা। বল দেখি কেন? বাল্য বিবাহই ইহার কারণ।

ঐ সন্তানের মাতার দিকে চাহিয়া দেখ, তাহার বয়স ১৩ বৎসর। সে বালিকা, খেলিতে চায়, পড়িতে চায়, কিন্তু তাহার সন্তান তাহাকে দেয় না! তাহার শরীর কত দুর্ব্বল, চাহিয়া দেখ সন্তান হওয়ার পর হইতে তাহার আর রোগ ছাড়ে না। সে বোধ হয় ২৫ বৎসরের অধিক বাচিবে না। ইহার কারণ কি জান? বাল্য বিবাহ!

পাড়ার ঐ যুবককে দেখ, তোমরা মনে কর উহার বয়স ৪০ বৎসর, কিন্তু তাহা নয়, উহার বয়স ২৫ বৎসর মাত্র। এই বয়সেই তাহার পাঁচটী সন্তান, উহার আয় মাসিক ২০্ টাকা, পরিবারের আহারের ব্যয় ১৯্ টাকা, আর এক টাকা যাহা অবশিষ্ট আছে, তদ্দারা ছেলেদের বস্ত্র দিবে, না ঔষধ দিবে, না পড়িবার সংস্থান করিবে। দেখ ইহাদের কেমন কষ্ট। কয়েক মাস হইল, উহার একটী সন্তান নষ্ট হইয়াছে, কারণ তাহার রোগ হইয়াছিল, সে সামান্য রোগ কিন্তু উত্তম চিকিৎসা হয় নাই, কারণ চিকিৎসার ব্যয় কোথা হইতে দিবে! এইরূপে অনাহারে, রোগে, শোকে যুবকের মুখ সর্ব্বদা মলিন। তোমরা এইরূপ ক্লেশ চাও? যদি না চাও তবে বাল্য-বিবাহ করিওনা।

আর কত প্রকারে তোমাদিগকে বলিব, শত শত প্রকারে বাল্য-বিবাহ দেশের ও সমাজের নানা অনিষ্ট করিতেছে। বাঙ্গালী পরিবারে যত অকাল-মৃত্যু, শোক, দারিদ্র্য, রোগ, দেশের যত অভাব সকলই এই বাল্য বিবাহ জনিত। অতএব সাবধান এই রাক্ষসকে সমূলে বিনষ্ট কর।

তোমরা আর কএক বৎসর পরেই দেখিবে, পিতা আজ তোমাদিগকে এই দুঃখ বন্ধনে বান্ধিতে যত্ন করিতেছেন। পিতামাতা পরম পূজনীয়, কিন্তু তাহা বলিয়া তাঁহাদের অসঙ্গত কথাও যে মান্য করিতে হইবে তাহা নহে। তোমরা কাহারও কথায় বাল্য বিবাহ করিও না। সাবধান শিশুগণ এই অনিষ্ট-স্রোতকে আর প্রবাহিত করিও না।

ক্রমশঃ

অবোধ ছেলে।

! ছি! ছি! প্রিয়! তোমাকে কতদিন বলেছি, যদি বনের পাখীকে ধরে নিয়ে এসেছ তবে তাকে সময়ে খেতে দিও। দেখদেখি, পাখী মরেগেছে! এখন কার দোষ দিই বলতো?

মায়ের এই কথা শুনিয়া প্রিয়নাথ, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"আমি ঝিকে খাবার দিতে বলে মামার বাড়ীতে গেলাম, ঝি কেন খাবার দিলে না? অ্যাঁ, অ্যাঁ, সে কেন খাবার দিলে না? আমার দোষ কি?"

মা বলিলেন—"ওরে মূর্খছেলে! ঝি কি তোমার কথা শুনতে পেয়েছিল? আর শুনতে পেয়েও যদি না দিয়ে থাকে, তাহলেই বা তার অপরাধ কি? তার অনেক কাজ, হাতের কাজ গুলো না শেষ করেতো অন্য কাজে যেতে পারেনা। ঝি কি বন থেকে পাখী কুড়িয়ে এনে-ছিল? আহা হা! বনে থাকিলে পাখীটী কত সুখে থাকিত। হাজার হাজার ঝাঁক বেঁধে কেমন মনের আনন্দে আকাশে উড়ে বেড়াত। কত ভাল ভাল ফল খেত! তা এসব সুখ থেকে তাকে টেনে আন্‌তেই বা তোমায় কে বলেছিল; আর এমন করে খেতে না দিয়ে মেরে ফেল্‌তেইবা কে বলেছিল?" বালক আর কোন কথা বলিতে পারিলনা; কেবল কাঁদিতে লাগিল।

মা বলিলেন "দেখ বাছা! নিজের জন্য পা-খীকে খাঁচায় পুরে রেখেছিলে, এই তো এক অন্যায় কাজ, তারপরে যদি তাকে ভাল খেতে দিতে, যত্ন কর্‌তে, তাহলেও কতক সুখের কথা ছিল, কিন্তু তাতেও তোমার মন উঠলোনা,—আবার না খেতে দিয়ে মেরে ফেল্‌লে? এ বড় অন্যায় কাজ হয়েছে, তা বোধ হয় বুঝ্‌তে না পেরেই এরূপ করেছ। তা যাক্‌, ভবিষ্যতে সাবধান হ'ও, নিজের সুখের জন্য কাহাকেও মিছামিছি ক্লেশ দিওনা! আরও বিশেষ,যারা কথা বলে মনের কষ্ট জানাতে পারেনা, কি নিজের দুঃখ দূর কর্‌তে পারেনা, কখনও তাদের প্রতি অত্যাচার ক'রনা।"

রামধনু।
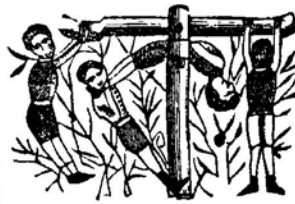
ন একটী স্কুলে বি-কালে ছুটী হইয়া গিয়াছে, কিন্তু বৃষ্টি হইতেছিল বলিয়া ছা-ত্রেরা তখনও বাড়ী যায় নাই। কয়েকটী ছাত্র বৃষ্টি থামিবার পর বাড়ী যাওয়ার উদ্‌যোগ করিতে লাগিল; ইহার মধ্যে তাহাদের একজন বলিয়া উঠিল 'দেখ, আকাশে কেমন সুন্দর রামধনুক উঠিয়াছে।' তাহা শুনিয়া কয়েকটী বালক সেই রামধনুকের দিকে তাকাইয়া নানারকম কথা বলিতে লাগিল; কেহ বলিল 'দেখ ঐ রামধনুক কেমন সুন্দর লাল দেখা যাইতেছে।' কেহবা বলিল 'দেখ, ঐ রামধনুক কত লম্বা!' ইত্যাদি। তাহাদের মধ্যে গোপাল নামে একটী

বালক বলিল 'আচ্ছা, বিপিন, ঐ রামধনুক কি জিনিষ বল দেখি।' বিপিন বলিল 'আমি শুনিয়াছি যে ত্রেতাযুগে রাম নামে এক প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন, তিনি অতিশয় বলবান্ ছিলেন, তাঁহার এক বৃহৎ ধনুক ছিল, সেই ধনুক সময় সময় দেখা যায়।' গোপাল তাহা শুনিয়া বলিল 'রামধনুক যদি বাস্তবিক ধনুকই হয়, তবে উহা কোন সময়ে দেখা যায় আর কোন সময়ে দেখা যায়না কেন? আকাশে চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র বৎসরের সকল সময়েই ত দেখা যায়।' এইরূপে ক্রমে ক্রমে রামধনুক বাস্তবিক কি জিনিষ তাহা লইয়া বালকদিগের মধ্যে তর্ক উপস্থিত হইল, তাহারা শেষে শিক্ষকের নিকট যাইয়া ঐ বিষয়ে তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করিল। শিক্ষক বলিলেন 'আচ্ছা, গোপাল, প্রথম দেখ দেখি রামধনুকে কয়টা রং আছে।' গোপাল রাম ধনুকের দিকে ভাল করিয়া তাকাইয়া গুণিয়া বলিল 'আন্দাজ ছয় সাতটী রং আছে।' তখন শিক্ষক অন্যান্য সকলকেও বলিলেন যে তাহারাও রামধনুকে কয়টী রং আছে ভাল করিয়া দেখুক। সকলে দেখিয়া সাব্যস্ত করিল যে রাম ধনুকে এই সাতটী রং আছে, লাল, অরেঞ্জ (কমলা লেবুর রঙ্গের ন্যায় রং), হরিদ্রা, সবুজ, নীল, ইণ্ডিগো (গাঢ় নীল), আর ভায়লেট্ (বেগুনে)। ক্রমে ক্রমে আকাশে রৌদ্র উঠিলে, শিক্ষক তখন রৌদ্রের মধ্যে একটা ছোট গাছের নিকট একখানা লম্বা তিন কোণা কাচ লম্বা করিয়া ধরিলেন, আর দেখা গেল যে ঐ গাছের ছায়ার উপর এক যায়গায় সুন্দর রঙ্গিন আলোক পড়িল। তখন সকল বালকই সেই আলোকের দিকে তাকাইল; তাহারা দেখিতে পাইল যে রামধনুকে যে কয়টী রং দেখিয়াছিল ঐ আলোকেও ঠিক সেই কয়টী রং আছে, ঐ আলোকে আর রামধনুকে বিভেদ এই যে রামধনুক অত্যন্ত প্রশস্ত আর ঐ আলোক তিন চার অঙ্গুলির অধিক প্রশস্ত নহে। শিক্ষক তাঁহার হাতে যে কাচ লম্বা করিয়া ধরিয়াছিলেন, তাহা নামাইয়া রাখিলেন আর অমনি গাছের ছায়ার উপরে যে আলোক পড়িয়াছিল তাহা অদৃশ্য হইল। তিনি আবার কাচ খানি সোজা করিয়া ধরিলেন আবার সেই আলোক দেখা গেল; আবার তাহা নামাইয়া রাখিলেন, আবার আলোক অদৃশ্য হইল। এই রকমে যতবার তিনি কাচখানি লম্বা করিয়া ধরিলেন ততবার রঙ্গিন আলোক দেখা গেল, আর যতবার কাচখানি নামাইয়া রাখিলেন ততবার আলোক অদৃশ্য হইল। বালকেরা ইহাতে সহজেই বুঝিতে পারিল যে ঐ কাচ হইতেই ঐ আলোক বাহির হইয়া আসিতেছে। শিক্ষক ছায়ায় লইয়া গিয়া কাচখানি লম্বা করিয়া ধরিলেন, তখন আর ও রকম আলোক দেখা গেল না, যতক্ষণ ছায়ায় রাখিলেন, ততক্ষণ রঙ্গিন আলোক দেখা গেল না। আবার যখন রৌদ্রে আনিয়া কাচখানি লম্বা করিয়া ধরিলেন তখন আবার রঙ্গিন আলোক দেখা গেল। এই রকমে যতবার রৌদ্রে কাচ ধরিলেন ততবার রঙ্গিন আলোক দেখা গেল আর যতবার ছায়ায় কাচ ধরিলেন ততবার তাহা দেখা গেল না। ছাত্রেরা ইহাতে বুঝিতে পারিল যে সূর্য্যের আলোক ঐ কাচের উপর পড়িলে যখন বাহির হইয়া আইসে, তখন বিবিধ বর্ণ ধারণ করে। সূর্য্যের আলোক সাদা, কিন্তু ঐ কাচের মধ্যে প্রবেশ করিলে তাহা রামধনুকে যে সাতটী রং আছে সেই সাত রংয়ের আলোকে বিভক্ত হইয়া বাহির হয়। ছাত্রেরা বুঝিতে পারিল যে যাহাকে আমরা সাদা রং বলি, তাহা একটী রং নহে, তাহা সাতটী ভিন্ন ভিন্ন রং একত্র হইয়া হয়। শিক্ষক এখন বালকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'তোমরা এখন বলিতে পার, আকাশে রামধনুক কেন দেখা যায়?' কেহই ভাল উত্তর করিতে পারিল না। তাহাতে তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন 'তোমরা বলিতে পার, রামধনুক কখন দেখা যায়?' গোপাল

বলিল 'বর্ষাকালে।' শিক্ষক জিজ্ঞাসা করিলেন বর্ষাকালে আকাশের অবস্থা কেমন? বিপিন বলিল 'আকাশে তখন খুব মেঘ থাকে।' শিক্ষক জিজ্ঞাসা করিলেন 'রামধনুক দিনের বেলায় উঠে কি রাত্রে উঠে?' একটী বালক বলিল 'নিশ্চয়ই দিনের বেলায়।' শিক্ষক পুনরায় বলিলেন 'এখন তোমরা বলিতে পার আকাশে রামধনু ওঠে কেন?' গোপাল বলিল 'আমি পারি।' শিক্ষক জিজ্ঞাসা করিলেন 'বল দেখি?' গোপাল বলিল 'সূর্য্যের আলোক কাচের মধ্যে প্রবেশ করিয়া যেমন বিবিধ বর্ণের আলোকে বিভক্ত হয়, মেঘের মধ্যে প্রবেশ করিয়াও সেই রকম বিবিধ বর্ণের আলোকে বিভক্ত হইতে পারে।' শিক্ষক বলিলেন 'ঠিক বলিয়াছ। তিন কোণা কাচের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সূর্য্যের আলোক যেমন সাত রকমের আলোকে বিভক্ত হয়, সূর্য্যের আলোক মেঘের জলের মধ্যে প্রবেশ করিয়াও সেই রকম বিভক্ত হয় ও তাহাতে আকাশে রামধনু দেখা যায়।' শিক্ষক তাহার পর এই উপলক্ষে বর্ণ সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বুঝাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন যে, 'রামধনুকে যে সাতটী রং দেখা যায় তাহার মধ্যে লাল, সবুজ, আর ভায়লেট এই তিনটী মূলবর্ণ, আর অন্য কয়টী বর্ণ ইহাদিগের হইতে উৎপন্ন। লালের মধ্যে লাল ভিন্ন অন্য কোন রং নাই, সবুজের মধ্যে সবুজ ভিন্ন অন্য কোন রং নাই, ভায়লেটের মধ্যে ভায়লেট ভিন্ন অন্য কোন রং নাই। কিন্তু যাহাকে আমরা হরিদ্রা রং বলি তাহা লাল ও সবুজ এই দুই বর্ণ একত্র করিলে উৎপন্ন হয়, নীল রং সবুজ ও ভায়লেট এই দুই রং হইতে উৎপন্ন, সাদা রং লাল, সবুজ ও ভায়লেট এই তিন হইতে উৎপন্ন। যাহাকে আমরা কাল রং বলি তাহা বাস্তবিক রং নহে, তাহা রংএর অভাব মাত্র; অর্থাৎ যেখানে আমরা কোন রংই দেখিতে পাই না তাহাকে আমরা কাল বলিয়া থাকি। আমরা চারিদিকে যে সকল নানাবর্ণের গাছ, ফুল, পাখী ইত্যাদি দেখিতে পাই তাহাদের রং কোথা হইতে আইসে? সূর্য্যের রং সাদা, তাহা সূর্য্যের আলোকেই আছে। কিন্তু গাছের পাতায় কোন আলোক নাই, অন্ধকার রাত্রে গাছের পাতা দেখা যায় না, যদি গাছের পাতায় আলোক থাকিত তবে তাহা অন্ধকার রাত্রেও দেখা যাইত। সূর্য্যের আলোকে আমরা গাছের পাতা দিনের বেলায় দেখিতে পাই, সূর্য্যের আলোক গাছের পাতায় পড়িয়া যখন তাহা হইতে আমাদের চক্ষে আসিয়া পড়ে, তখন আমরা পাতা দেখিতে পাই। সূর্য্যের আলোক সাদা, তবে গাছের পাতা সবুজ দেখায় কেন? ইহার উত্তর এই যে সূর্য্যের আলোক গাছের পাতায় পড়িলে তাহার সবুজ অংশ টুকু বাহির হইয়া আইসে, অন্যান্য অংশ ঐ পাতার মধ্যে থাকিয়া যায়। যদি সূর্য্যের আলোকের সমুদায় অংশ গাছের পাতা হইতে ফিরিয়া আসিতে পারিত, তবে গাছের পাতাও সাদা দেখাইত। এই রূপে সূর্য্যের আলোকে আমরা যাহা কিছু দেখিতে পাই, তাহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ তাহাদিগের মধ্য হইতে সূর্য্যের আলোকের যে যে প্রকারের অংশ ফিরিয়া বাহিরে আসিতে পারে তাহার উপর নির্ভর করে। লাল গোলাপ ফুলের রং লাল, কারণ তাহার মধ্য হইতে সূর্য্যের লাল অংশটুকু বাহির হইয়া আইসে, অন্যান্য অংশ গোলাপ ফুলের মধ্যেই রহিয়া যায়। সাদা গোলাপের রং সাদা, কারণ সূর্য্যের আলোকের সমুদায় প্রকার অংশই তাহা হইতে ফিরিয়া বাহিরে আইসে। কালির রং কাল, কারণ সূর্য্যের আলোকের কোন প্রকার অংশই তাহা হইতে ফিরিয়া আইসে না। শিক্ষক অবশেষে তাহার ছাত্রদিগকে এই বুঝাইয়া দিলেন যে আমরা যত রকম রং দেখিতে পাই, তাহার মধ্যে লাল, সবুজ ও ভায়লেট এই তিনটী মূলবর্ণ, অন্যান্য সমুদয় বর্ণ ইহাদের মধ্যে একটী হইতে কি দুই বা তিনের যোগে উৎপন্ন, যে সকল বস্তুর

নিজের আলোক আছে, তাহাদিগের অনেকের বর্ণই তাহাদিগের বর্ণ। আর যে সকল বস্তুর নিজের আলোক নাই, অন্য কোন বস্তুর আলোকে যাহাদিগকে আমরা দেখিতে পাই, তাহাদিগের বর্ণ তাহাদিগের মধ্য হইতে কি প্রকার আলোক বাহির হইয়া আসিতে পারে তাহার উপর নির্ভর করে।" ছাত্রেরা শিক্ষকের নিকট এই সকল বিষয় শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে দিতে বাড়ী চলিয়া গেল।

কেশবচন্দ্র সেন।

আমরা ছেলেবেলা দেখিতাম যে যে সকল লোক সাধারণ লোকের মত নয়, খাওয়া পরার ঠিক নাই, যে পোষাক দাও তাই পরে, মাছ মাংস ছাড়া আর যা দাও, তাই খায়, নেহাত ভাল মানুষ, অথচ কোন চলিত কাজ করিতে বলিলেই 'ফোঁষ' করিয়া উঠে, মূর্খ বামনপণ্ডিতদের মানেনা, চলিত 'আচার বিচার' গ্রাহ্য করে না, মাঝে মাঝে চোখ বোজে, আর যাতে মন নাই এমন কাজ করিতে বলিলেই আগুণ হইয়া উঠে, এই রকম লোককে সকলেই বলিত "এঃ! একেবারে মাটী হয়ে গেছে, কেশব সেনের দলে ঢুকেছে।" আমরা তখন ভাবিতাম, 'কেশব স্যানের' দলে যাওয়া বুঝি একটা সখের কাজ। যেমন যাত্রার দল, থিয়েটারের দল, বা কোন নেশার দল, সেইরূপ কেশব বাবুর 'দল'। কেশব বাবুর দলে গেলে বড় একটা খারাপ কাজ হইল, মনে ভাবিতাম। এইরূপ ভাবিতাম বটে, কিন্তু দেখিতাম 'কেশব স্যানের' দলে যারা যাইত তাদের এদিকে "কাছা কোচা"র ঠিক নাই বটে, কিন্তু দেশের সমস্ত ভাল কাজে প্রাণের টান, যে ভাল কাজে লাগাইয়া দাও, আগুণের মত পড়িয়া দেখিতে দেখিতে কাজ শেষ করিয়া তোলে। 'দেবতা ব্রাহ্মণ' আচার ব্যবহার মানে না বটে, কিন্তু প্রাণ দিয়ে দেশের জন্য খাটে, রোগীর সেবা শুশ্রূষা করে, এবং গুরুজনকে মান্য করিয়া চলে। এ কি আশ্চর্য্য! কেশব বাবুর দলে গিয়া এ কি হয়? আচার ব্যবহার, 'রকম সকম,' চলাফেরা, এ কেমন হইয়া যায় কেন? ভাবিলাম কেশব বাবু বুঝি কি ভেলকী করে তাহার দলের লোকদিগকে বাঁধিয়া রাখেন, তাঁর যাদুমন্ত্রে বুঝি লোকগুলা বিগড়ে যায়!

বড় হইলাম। কেশব বাবুর বক্তৃতা শুনিয়া বুঝিতে পারি, এমন বয়স হইল। একদিন তাহার বক্তৃতা শুনিতে গেলাম, একদিন শুনিয়া আর এক দিন শুনিতে ইচ্ছা হইল, ক্রমে আর একদিন, এই রূপে অনেক দিন তাঁহার বক্তৃতা শুনিলাম; তাঁহার অনেক ছোট খাট উপদেশও শুনিলাম। তখন বুঝিলাম কেশব বাবু কি যাদু করে! তখন দেখিলাম কেশব বাবুর 'ভেলকী' করার শক্তি আছে বটে। আমরা কে? কোথা হইতে এসেছি? কোথায় যাব? আমাদের ঈশ্বর কে? তিনি কিরূপ? তিনি আমাদের কত দয়া করেন? আমরা কিত পাপী? আমরা আমাদের দেশের ও সকল লোকের নিকট কি কি কাজ করিতে বাধ্য আছি?—এই সকল কথা কেশব বাবুর কাছে এমন করিয়া শুনিলাম, শুনিয়া

এমন করে বুঝিলাম, যে আর মন থেকে নাড়িতে পারিলাম না, আমি কেশব বাবুর গুণের কাছে, তাঁর বিদ্যাবুদ্ধি ও ধর্ম্মজ্ঞানের কাছে যেন চিরদিনের মত কেনা হইয়া পড়িলাম।

আজ আর কেশব বাবু নাই। পৃথিবীতে তাঁহার শরীরটী নাই, কিন্তু তিনি আমাদের মনে চিরকাল থাকিবেন। কেশববাবুর অনেক মতের সঙ্গে আমাদের মত মেলেনা, তবুও তাকে এত ভক্তি করি কেন? যে কেশব বাবু সমস্ত পৃথিবীর লোকের নিকট নিজের বিদ্যাবুদ্ধি ও ধর্ম্মজ্ঞানের জন্য পূজা পাইয়াছেন, স্বয়ং মহারাণী যে কেশব বাবুর সহিত এক যায়গায় বসিয়া আহার করিয়া সুখী হইয়াছেন, বড় বড় রাজা বাহাদুর, রায় বাহাদুর, লাট বাহাদুর, খাঁ বাহাদুর, দেশ দেশান্তর হতে বেড়াতে এসে যার সঙ্গে আলাপ করে কৃতার্থ হয়ে গিয়াছেন, তাঁকে ভক্তি করি কেন, একথা কি আর বলিতে হইবে? আমাদের দেশে তাঁর মত লোক একশত বছরের মধ্যে হয় নাই, এর পরে যে দুই একশ বছরের মধ্যে হ'বে, তাও বোধ হয় না। এখন কথা এই, কেশব বাবু কেমন করে এত বড় লোক হ'লেন? তাহাই বলিতেছি, বালকবালিকাগণ! মনোযোগ করে শোন:—

বাবু কেশবচন্দ্র সেন ইংরাজী ১৮৩৮ সালের ১৯এ নবেম্বর কলিকাতা নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যে পরিবারে জন্মেন, তাহাতে যেমন লক্ষীর দৃষ্টি ছিল, তেমনি সরস্বতীরও দয়া ছিল। কেশব বাবুর পিতা প্যারীমোহন সেন দেখিতে যেমন সুন্দর ছিলেন, দয়া ধর্ম্ম প্রভৃতিতেও তেমনি অলঙ্কৃত ছিলেন। কেশব বাবুর মা আজিও বাঁচিয়া আছেন, তাঁহার গুণের কথা এখন বলা ভাল নয়, তবে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে কেশব বাবু মরিবার সময় মায়ের পায়ের ধুলো লইয়া বলিয়াছিলেন "মা! তোমার মত মা সকলের হয় না। আমি তোমারই গুণগুলি পাইয়া মানুষ হইয়াছি।" এমন বাপমায়ের যে ছেলে সে কেন ভাল হইবে না? কেশব বাবু ছেলেবেলা ভক্তের মত সাজিতে ভাল বাসিতেন অর্থাৎ সকাল সকাল স্নান করিয়া, গরদের কাপড় পরিয়া, সমুদায় শরীরে চন্দন মাখিতেন। কি বাড়ীতে, কি পাঠশালে, কেশব বাবু নূতন কিছু না করিয়া কোথাও ছাড়িতেন না। অনেক ছেলের বুদ্ধি যেমন ঘুমাইয়া থাকে, কোন কিছু জানিলে বা কোন কিছু পড়িলে, তাহারা যেমন কেবল শুনিয়াই বা পড়িয়াই চুপ করিয়া থাকে, নূতন কিছু ভাবিবার, জানিবার, বা শিখিবার বিষয় খুঁজিয়া পায় না, কেশব বাবুর বুদ্ধি সেরূপ ছিল না। তিনি সর্ব্বদাই নূতন বুদ্ধি খাটাইয়া নূতন ফিকির, নূতন কার্য্য, নূতন পথ সকল বাহির করিতেন, এবং এই গুণেই সমবয়সী ছেলের মহলে রাজার মত মান পাইতেন। তোমার আমার বুদ্ধির চালনা হয় না, কাজেই অকেজো অস্ত্রের মত মরিচা ধরিয়া যায়, আর আমরা বড়লোক হইতে পারি না, কিন্তু কেশব বাবুর বুদ্ধি সর্ব্বদাই ঘুরিত, সর্ব্বদাই কাজে লাগিত। তাই তিনি পরজীবনে বড়লোক হইতে পারিয়াছিলেন।

একবার টাউনহলে এক সাহেব বাজি দেখাইতে আসিয়াছিল; কেশব বাবু সেই বাজি দেখিয়া আসিলেন। বাড়ীতে আসিয়া সাহেব সাজিয়া সেই বাজিগুলি তিনি নিজে করিলেন, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে এমনি সাহেবী সুরে কথা বলিলেন যে দুএক জন সাহেব যাঁহারা কেশব বাবুর বাজি দেখিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা পর্য্যন্ত মনে করিয়াছিলেন যে সত্যসত্যই একজন সাহেব বাজি দেখাইতেছে। কেবল বাজি দেখান লইয়া নহে, নাটক অভিনয়েও তিনি খুব পরিপক্ক ছিলেন। বাঙ্গালী বালক ইংরাজী নাটক বুঝিয়া অভিনয় করিতেছে, ইহা কি আশ্চর্য্যের বিষয় নহে? এতদ্ভিন্ন প্রায় এক বৎসর পর্য্যন্ত ভয়ানক পরিশ্রম করিয়া উদ্যোগ করিয়া কেশববাবু "বিধবা বিবাহ নাটক" নামে একখানি

নাটক অভিনয় করেন। বিধবাদিগের দুঃখ লোককে জানাবার জন্যই এই অভিনয়টী করা হইযাছিল। কেশব বাবুর একজন জীবনচরিত লেখক বলেন, এই অভিনয় চমৎকার হইযাছিল, যে দেখিযাছে সেই বিধবার দুঃখে দুঃখিত হইযাছে। বলিতে কি,—সেই দিন হইতেই বিধবার জন্য দুটো কথা কহিবার লোক যুটিয়াছে।

কেশববাবু যখন স্কুলে পড়িতেন, তখন প্রত্যেক বারেই পুরস্কার পাইতেন। তাঁহার কেমন প্রকৃতি ছিল, তিনি যাহা নূতন শিখিতেন, দশজনকে তাহা না বলিযা থাকিতে পারিতেন না। স্কুলে যাহা শিখিতেন, বাড়ীর মেযেদের, পাড়ার ছেলে-দের তাহা শিখাইতেন। যে কাজটী ভাল বলিযা মনে হইত, তিনি তাহা করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। দরিদ্রদিগের জন্য রাত্রিতে স্কুল করিতে আরম্ভ করিযা চারি বৎসরকাল কেশব বাবু গরি-বের ছেলেদিগকে শিক্ষা দিলেন, কিন্তু শেষে নানা কাজের ঝঞ্ঝাটে স্কুলটী থাকিল না। ইহা ছাড়া তিনি ধর্ম্ম ও নীতির আলোচনার জন্য গুড্উইল ফ্রেটার্নিটী বা "সুদিচ্ছা ভ্রাতৃবৃন্দ" নামে একটী সভা স্থাপন করেন, এবং ভাল লিখিতে পড়িতে এবং বলিতে শিক্ষা করিবার জন্য ব্রিটিশ ইণ্ডিযা সোসাযেটী বা "ব্রিটিশ ভারত সমাজ" নামে একটী সভাও সংস্থাপন করেন। এই সকল কাজ করিযা, অনেক পড়িযা, অনেক ভাবিযা, ধর্ম্মের দিকে তাঁহার মন গেল। বাড়ীর কর্ত্তাদের কথায় চাকরী করিতে আরম্ভ করিলেন বটে, কিন্তু চাকরী করিযা যে সময়টুকু পাইতেন, সেই "আফীসে" বসিযাই, সেই সময়টুকু নানারূপ ভাল কথা লিখিয়া কাটাইতেন। এই সকল উপদেশ তিনি ছাপাইয়া সকলকে দিতেন; লোকে তাঁহার নূতন রকমের মত দেখিযা আশ্চর্য্য হইত। তাঁহার আফীসের বড় সাহেবেরা কেশব বাবুর সহিত আলাপ করিয়া দেখিতেন. তাঁহার মন ধর্ম্মের জন্য আগুণের মত 'হুহু' করিয়া জ্বলিতেছে। কেশব বাবু কর্ম্ম ছাড়িযা দিযা বাড়ী আসিলেন। ইতিপূর্ব্বেই তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাস করিযাছিলেন, সম্প্রতি বাড়ীর লোকের তাড়নায় স্ত্রীকে লইযা শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গৃহে গিযা আশ্রয় লইলেন।

কেশব বাবুর বাল্য জীবন এই খানেই একরূপ শেষ হইল, এবং এই খান হইতেই তাঁহার বড়লোক হইবার সূচনা হইল। ইঁহার পরজীবনের কথা আমরা আর বলিব না, কেবল এই বলি যে, যে ব্যক্তি

(১) সর্ব্বদা আপনার বুদ্ধি ঘুরাইয়া কাজ করে, পরের মুখ চায় না,

(২) যে কার্য্য ভাল বলিয়া বুঝে তাহাই করে, কাহারও ভয়ে টলে না,

(৩) ঈশ্বরকে ভক্তি করিয়া ধর্ম্মকে সত্য বলিয়া মনে করে,

সে নিশ্চযই বড়লোক হইতে পারে। লোকে তাহাকে কেশব বাবুর মতন দেখুক আর নাই দেখুক, ঈশ্বরের চক্ষে সে যে বড়, তাতে কোন সন্দেহ নাই?

সহজে কি বড়লোক হওয়া যায়?

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সেই বাড়ীর কর্ত্তা আমাদের অবস্থা দেখিয়া বড় দুঃখিত হইলেন; আমাদের সম্বন্ধে যা যা কথা সমস্ত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। আমরা কোন কথারই ঠিক উত্তর দিই নাই। স্থানে স্থানে দু একটী কথা গড়িয়া কহিতে হইল। তিনি আমাদের কথায় বুঝিয়া লইলেন যে আমরা দুজন পথ হারাইয়া ঘুরিতেছি; বলিলেন, কাল আমি একজন লোক দিয়া তোমাদের দুজনকে বাড়ী পাঠাইয়া দিব।

খাইবার সময় ভদ্রলোকটী আমাদের সম্মুখে বসিয়া থাকিলেন, আমাদের আহার শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত উঠিলেন না। একটী কুঠরীতে আমাদের দুজনের ঘুমাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হইল। সেখানে আর কেহ ঘুমাইতে আসিল না। আমি কিছু সুবিধা বোধ করিলাম; ভাবিলাম, কর্ত্তা যাহা বলিলেন তাহা কাজে করিলে আর বড়লোক হওয়া হবে না', সুতরাং কেহ জাগিবার পূর্ব্বেই কর্ত্তাকে ধন্যবাদ না দিয়া চলিয়া যাওয়া ঠিক হইল। সতীশকে ডাকিলাম 'সতীশ, সতীশ!"—সতীশ কথা কয় না। সতীশের চক্ষে জল পড়িতেছে! কর্ত্তার কথায় সতীশের মন ফিরিয়া গেল নাকি? বাস্তবিক ও তাই, অনেক পীড়াপীড়ি করার পর বলিল "আমি তোমার সঙ্গে যাইব না।" আপনারা কি মনে করিতেছেন? সতীশের কথা শুনিয়া আমার মনের ভাব কি প্রকার হইল? বড়লোক হওয়ার ইচ্ছাটা আমার এত বেশী হইয়াছিল, যে বাড়ী ছাড়িয়া অবধি আমার বোধ হইতেছিল যেন বড় লোকের কাছাকাছি একটা কিছু হইয়াছি! সতীশকে আমি কাপুরুষ মনে করিতে লাগিলাম। সতীশের ও মা বাপ আছেন আমারও মা বাপ আছেন। প্রভেদ এই যে আমি স্বার্থপর, সতীশ তাহা নহে। সতীশের মনে যে সকল চিন্তা উঠিতেছিল, আমার অন্তঃকরণে তাহারা স্থান পাইল না। আমি সতীশের অবস্থা বুঝিতে পারিলাম না। মা বাপের মনে কষ্ট দেওয়া আমার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু নিজের কথা লইয়া এত ব্যস্ত ছিলাম যে তাঁহাদের কথা ভাবিবার অবসরই পাই নাই। নানা চিন্তার মধ্যে ঘুম আসিল। ঘুমাইতে ঘুমাইতে স্বপ্ন দেখিলাম যে আমি বাড়ীতে কি একটা কথা লইয়া মার সঙ্গে রাগ করিয়াছি। মা কত সাধিতেছেন, আমার ভ্রূক্ষেপ নাই; রাগ যেন ক্রমেই বাড়িতেছে। মার চক্ষে জল পড়িতেছে দেখিয়া যেন আমার প্রতিহিংসার ভাবটা চরিতার্থ হইতে লাগিল। আমি দাঁত খিচাইয়া মাকে বিদ্রূপ করিতে লাগিলাম। মা আমার হাতে ধরিতে আসিলেন; আমি পাশের একটা গাছে উঠিতে চেষ্টা করিলাম। হঠাৎ পা পিছলিয়া পড়িয়া যাইতেছিলাম, এমন সময় আবার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। স্বপ্নের কথা ভাবিয়া চখে দু ফোটা জল আসিল, কিন্তু আবার সেই বড়লোক হওয়ার কথা! সতীশের মন ফিরিয়া গিয়াছে। সতীশ জাগিয়া আর যাইতে চাহিবে না, হয়ত আমারও যাওয়া হইবে না। রাত হয় তো আর বেশী নাই; এই বেলা সতীশকে না বলিয়া চলিয়া যাওয়াই ভাল। আমি আস্তে আস্তে উঠিলাম। আমার কাপড় আর টাকাগুলি লইয়া বাহির হইলাম। রাত্রি তখন ও অনেক ছিল কিন্তু আমার বোধ হইতে লাগিল যেন এই ভোর হইয়া আসিতেছে। একটা বড় রাস্তা ধরিয়া চলিলাম। অনেকক্ষণ হাঁটিলাম; কিন্তু রাত ফুরায় না। রাস্তাটা একটা বড় নদীর ধারে যাইয়া শেষ হইয়াছে; আমিও সেইস্থানে যাইয়া থামিলাম,—তার পর যাই কোথা? রাস্তাটা নিশ্চয় ও পারে যাইয়া আবার চলিয়াছে কিন্তু ওপারে যাই কেমন করিয়া? এতক্ষণ রাত ফুরাইল না। হয় তো আরও অনেক দেরি। ঘাটে একখানা নৌকা বাঁধা ছিল—নৌকার ছই নাই। একজন লোককে অনায়াসে ওরূপ নৌকা অনেক বার চালাইতে দেখিয়াছি, আমার বোধ হইতে লাগিল আমি ও পারি। নৌকায় উঠিতে বিলম্ব রহিল না। যে লগিটীতে নৌকা বাঁধা ছিল তাহা তুলিয়া লইলাম। ডাঙ্গায় ভর করিয়া ঠেলিয়া নৌকা জলে ভাসাইয়া দিলাম। জলের গায় এত জোর আগে ভাবি নাই। শোঁ শোঁ করিয়া নৌকার গায় জল বাঁধিতে লাগিল, নৌকা খানা ঘুরিয়া গেল। হঠাৎ ঘুরিবার সময় তাড়াতাড়িতে লগিটী ছাড়িয়া দিলাম। নৌকা ঘুরিয়া ঘুরিয়া ডাঙ্গা হইতে অনেক দূরে যাইয়া পড়িল—স্রোতে ভয়ানক বেগের সহিত ভাসিয়া যাইতে লাগিল। আমি কিছুকাল হতবুদ্ধি হইয়া থাকিলাম।

বিপদের পরিমাণটা প্রথম তত বুঝি নাই, শেষে কিছু কিছু করিয়া হুঁস হইতে লাগিল। মাথা ঘুরিয়া গেল। দুহাতে চোখ ঢাকিয়া বসিয়া পড়িলাম। ঢেউ গুলি তড়াক্ তড়াক্ করিয়া নৌকাখানাকে দোলাইতে লাগিল। তখন মায়ের সেই মুখখানি মনে হইল। কেন বাড়ী ছাড়িয়া আসিলাম? সেই অন্ধকার রাত্রি, সেই ভয়ানক নদী; আর বাড়ীর ছোট কুঠরীটী—সেই কোমল সুন্দর বিছানাটী—মনে হইল। দুই চক্ষে জল পড়িতে লাগিল। সেই আঁধারে পড়িয়া মা মা বলিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। কেন সতীশের সঙ্গে চলিয়া গেলাম না? তাহাকে কেন ছাড়িয়া আসিলাম? ক্রমশঃ -

বাগানেতে খেলা।

১

বাগানে ফুটেছে ফুল—
কত বরণের আহা!
কি সুন্দর সাজিয়াছে,
বলিতে না পারি তাহা।

২

কেউ সাদা ধপ্ ধপে,
কেউ রাঙ্গা টুক টুক,
কেউবা শতেক রং
কারোবা সোণার মুখ।

৩

ধীরে ধীরে বহে বায়ু,
ধীরে মেঘ খেলিতেছে,
গাছের আড়ালে হোথা
চাঁদ উকি মারিতেছে।

৪

বালক বালিকা দুটী
খেলিছে মনের সুখে,
করিতেছে ছুটাছুটী,
হাসিটী না ধরে মুখে।

৫

'আয় হেথা আয় বোন,
দেখ হেথা দেখ চেয়ে
বকুলের ফুলে আহা!
তলাটী ফেলেছে ছেয়ে!

৬

"আমি দাদা এক ছড়া
গাঁথি ভাই তবে মালা,
তোমারে পরায়ে দিয়ে
আবার করি খেলা।"

৭

"ওই দিক পানে চেয়ে,
একবার দেখ বোন!
গোলাপ একটী ফুটি
রূপে আলো করি বোন।'"

৮

"আহা কি সুন্দর ফুল,
দাওনা আমারে পাড়ি?
মাকে গিয়ে দিব আমি,
যখন যাইব বাড়ী।'"

৯

মেঘ সনে চাঁদ হোথা
খেলিতেছে লুকোচুরী;
বালিকা খেলিতে সাধ,
ডাকিল আদর করি—

১০

"এস চাঁদ, মেঘ সনে
শুধু লুকোচুরী খেল,
খেলিবে মোদের সাথে
কত খেলা আরও ভাল।"

১১

"মিছে ডেকে কাজ নাই
আসিবে না, বোন! শশী;
রাখিবারে কথা তোর
(ওই) তারাটী পড়িল খসি।"

১২

"আমি যদি, ওগো দাদা!
একরাশ তারা পাই,
তা হ'লে গাঁথিয়া মালা
তোমারে পরাই ভাই!"

১৩

"চল তবে চল বোন
কাজ নাই করে দেরি,
রাত হয়ে এল ওই,
চল যাই ঘরে ফিরি"।

১৪

"কেমন সুখেতে আজ
দিন কেটে গেল ভাই!
প্রণমি বিভুর পায়ে
চল এবে ঘরে যাই।"

আগামী বর্ষের পুরস্কার।

মরা আগামী বর্ষে নিম্নলিখিত-রূপ পুরস্কার দিতে ইচ্ছা করিয়াছি।

১। যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক ধাঁধার উত্তর দিতে পারিবেন, বর্ষশেষে তাঁহাকে একটী পুরস্কার দেওয়া যাইবে। যাঁহারা উত্তর দিবেন, তাঁহাদের বয়স ১২ বৎসরের কম হওয়া আবশ্যক।

২। ১৬ বৎসরের কমবয়স্ক বালক বা বালিকা যিনি সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট চিত্র করিয়া পাঠাইতে পারিবেন, তাঁহাকে একটী বিশেষ পুরস্কার দেওয়া যাইবে। রংএ বা পেন্সিলে, যিনি যে কোন বিষয়ে ইচ্ছা, চিত্র করিতে পারিবেন। আগামী ৭ই জুনের মধ্যে আমাদের নিকট পৌঁছা আবশ্যক।

৩। অথবা রচনা বিষয়ে তিনটী পুরস্কার দিব;— (ক) ৮ থেকে ১০ বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের বালক বালিকাদিগের জন্য; (খ) ১১ থেকে ১৩ বৎসরের পর্য্যন্ত বয়সের বালক বালিকাদিগের জন্য; এবং (গ) ১৪ থেকে ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের বালক বালিকাদিগের জন্য। প্রত্যেক শ্রেণীর রচনার বিষয় এই :—

(ক) "একটী ছোট ছেলে মাকে বেশী ভালবাসে না আপনার খেলানাকে বেশী ভালবাসে?" এই বিষয়ে গদ্য রচনা।

(খ) "একটী ছোট মেয়ে মরে গেছে, তার মা তার পাশে বসে দুঃখ করিতেছেন," এই বিষয়ে ৩০ লাইনের মধ্যে একটী গদ্য রচনা।

(গ) "কাক ডাকিতেছে, জলের মধ্যে তালগাছ, ঘোড়া ছুটিয়া গেল, ছোট খুঁকি কাঁদিয়া উঠিল, বাঘের ভয়, শিয়ালের বাচ্ছা, কি সর্ব্বনাশ! জামা যোড়া, বড়লোক, সাহসী পুরুষ, হৈহৈ শব্দ, শিকারী।" এই কথাগুলি বজায় রাখিয়া এবং ভাব ঠিক রাখিয়া একটী অর্থসংলগ্ন গদ্য রচনা। যত ইচ্ছা নূতন কথা বসাইতে পারিবে, কিন্তু রচনাটী ২০ লাইনের চেয়ে লম্বা হইবে না।

এই রচনাগুলি আগামী ৭ই জুনের মধ্যে আমাদের নিকট পৌঁছা আবশ্যক। প্রত্যেক রচনাতে স্কুলের শিক্ষক বা কোন কর্ত্তা ব্যক্তির স্বাক্ষর চাই, তিনি লিখিয়া দিবেন যে বালক বা বালিকা নিজে এই রচনাটী করিয়াছে।

ধাঁধা।

গতবারের প্রশ্নগুলির উত্তর।

১। প্রথম দর ৭টা করে পয়সায়, দ্বিতীয় দর তিন পয়সায় প্রত্যেকটা। প্রথম বারে প্রথম দরে প্রথম

বালিকা ৪৯ টা, দ্বিতীয় বালিকা ২৮টা, তৃতীয় বালিকা ৭টা। বাকী গুলি দ্বিতীয় বারে দ্বিতীয় দরে বিক্রিত হইল। প্রত্যেকের দশ পয়সা করিয়া লাভ হইল। ২। ঢাকা। ৩। ছাগল। ৪। গরু দুটী মুখোমুখি বাঁধা আছে, গোলমাল কি?

হাসাড়া স্কুলের হরিচরণ সেন প্রথমটীর অন্যরূপ উত্তর দিছেন। তাঁহার উত্তরও ঠিক হইয়াছে।

নূতন।

১। ১২৬ কে এমন চারভাগ কর, যে প্রথম ভাগে ২ যোগ করিলে, দ্বিতীয় ভাগ থেকে ২ বাদ দিলে, তৃতীয় ভাগকে ২ দিয়া গুণ করিলে, চতুর্থ ভাগকে ২ দিয়া ভাগ করিলে, যোগফল বিয়োগ ফল, গুণফল, ও ভাগ ফল চারিটীই সমান হবে।

২। সে কোন্ বস্তু যায, যার সর্ব্বোৎকৃষ্ট জিনিষ গুলিকেও লোকে পায়ের তলে মাড়ায়?

৩। এক গাছের ডালে ৭টা পাখী বসেছিল। একজন দুষ্ট ছেলে ঢেলা ছুড়িয়া দুটী পাখীকে মারিয়া ফেলিল। ডালে আর কটা পাখী রহিল?

৪। যাহার অর্দ্ধেকের চতুর্থাংশ পাঁচ টাকা, তাহার পঞ্চমাংশের চতুর্গুণ যত, তাহার ৫ গুণ কত মোহর? (১৬ টাকায় এক মোহর হয।)

সখা-সংক্রান্ত নিয়মাবলী।

১। সখার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কলিকাতা ও মফঃস্বলে এক টাকা মাত্র। প্রতি খণ্ডের নগদ মূল্য /১০ মাত্র। পোষ্টাল নোট, মণিঅর্ডার বা অর্দ্ধ আনার ডাকটিকিটে, "সখা কার্য্যাধ্যক্ষ" এই নামে সখার মূল্যাদি পাঠাইতে হইবে। ডাকটিকিটে মূল্য পাঠাইলে প্রত্যেক টাকায় কমিশন বলিয়া /০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

২। পত্রিকাস্থ চিত্রের সংখ্যা কিছুই নির্দ্দিষ্ট থাকিবে না, তবে প্রত্যেক সংখ্যায় যাহাতে অন্ততঃ এক খানি চিত্র থাকে আমরা সেদিকে দৃষ্টি রাখিব।

৩। বালকবালিকাদিগের রচনা উৎকৃষ্ট হইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইবে, তবে সুদীর্ঘ হইলে প্রকাশিত হইবে না।

৪। শিক্ষক এবং অভিভাবকদিগের পরামর্শ প্রভৃতি সাদরে গৃহীত হইবে।

৫। বালক বালিকাদিগের উপকারে আসিতে পারে, কেহ এরূপ কোন রচনা বা কোন সংবাদ কিম্বা সত্য ঘটনার বিশেষ বিবরণ আমাদিগের নিকট পাঠাইলে আমরা তাহা সাদরে প্রকাশ করিব।

৬। সখা-সংক্রান্ত সমস্ত পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে। কেবল রচনা, পরামর্শ প্রভৃতি সম্পাদকের নামে কার্য্যালয়ের ঠিকানায় পাঠান আবশ্যক।

৭। ধাঁধার উত্তর, আলোচনার বিষয়, বা সখায় প্রকাশ করিবার জন্য পত্র প্রভৃতি, পূর্ব্বের মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে আমাদিগের কার্য্যালয়ে পৌঁছা আবশ্যক।

৮। ঠিকানার পরিবর্ত্তন, তিন মাসের কম সময়ের জন্য হইলে, তাহা করা যাইবে না; অল্প সময়ের জন্য হইলে গ্রাহকগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্থানীয় ডাকঘরের সহিত পরিবর্ত্তনের বন্দোবস্ত করিবেন।

"সখা" কার্য্যালয়,
৫০ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট।
কলিকাতা।

শ্রীঅন্নদাচরণ সেন।
"সখা" কার্য্যাধ্যক্ষ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিতএবং ৫০নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, "সখা" কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

দ্বিতীয় ভাগ। মার্চ্চ, ১৮৮৪। ৩য় সংখ্যা।

সহজে কি বড় লোক হওয়া যায়?

তৃতীয় অধ্যায়।

এই ভাবে কতক্ষণ ছিলাম বলিতে পারি না। হঠাৎ নৌকা খানি এক দিকে যাইয়া ঠেকিল। চমকিয়া দেখিলাম কতকগুলি বড় বড় নৌকা, তাহারি একটাতে আমার নৌকা ঠেকিয়াছে। আমি সেই মুহূর্ত্তের জন্য আশ্বস্ত হইলাম, কিন্তু তার পরক্ষণেই নৌকা হইতে কতকগুলি কালো অর্দ্ধ-উলঙ্গ লোক বাহির হইয়া কেউ মেউ করিয়া কি বলিতে লাগিল; আমি বুঝিতে পারিলাম আমাকে গালি দিতেছে। তাহারা আমার কথা বুঝিল বলিয়া বোধ হইল না। আরো বেশী গালাগালি দিতে লাগিল। ক্রমে অন্যান্য নৌকার লোক আসিয়া গোলমালে যোগ দিল। আমার কথা শুনিয়া সকলেই ঐ লোকগুলিকে গালি দিতে লাগিল। একটী ভদ্র-লোক সেখানে ছিলেন। তিনি দয়া করিয়া আমাকে [illegible] নৌকায় লইয়া গেলেন। নিজ হাতে আমার পুটলীটী যত্ন পূর্ব্বক এক কোণে রাখিয়া-দিলেন। তার পর আমাকে বলিলেন "আমি কা—যাইতেছি, তোমার আপত্তি না থাকিলে আমার সঙ্গে যাইতে পার। আমার বাড়ীতে তোমার কোন ক্লেশ হইবে না"। আমি তাঁহার সঙ্গেই চলিলাম।

কা—ছোট একটী সহরের মত। অনেক লোক। বড় লোকও অনেকগুলি আছেন। আমি যাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলাম, তাঁহাকে এখানে কালিদাস বাবু বলিব,—তিনিও একজন বড় লোক। এসব দেখিয়া শুনিয়া আমার পুরাতন রোগ আবার দেখা দিল। আমি ভাবিতে লাগিলাম এখানে থাকিয়া বড় লোক হওয়া যায় কি? যায় বৈ কি? না হলে এরা এত গাড়ী ঘোড়া চড়ে কি করিয়া? বোধ হইল যেন কালিদাস বাবুর বাড়ীতে থাকিয়া থাকিয়া হঠাৎ এক দিন বড় লোক হইয়া যাইব।

এক দিন কালিদাস বাবু ডাকিলেন। কালি-দাস বাবুর উপর প্রথম হইতেই আমার বড় শ্রদ্ধা হইয়াছিল। যখনই তিনি আমাকে ডাকিতেন তখনই একখানা সুন্দর কিছু উপহার পাইতাম। আমার বয়সের অনেকেই এখন ভাল কাজ করি-

তেছেন, কিন্তু আমার যেন তখনও শিশু-ভাবটা যায় নাই। কালিদাস বাবু ও তাঁহা বেশ বুঝিতেন; যাহা হউক আমি কালিদাস বাবুর নিকট যাইয়া দাঁড়াইলাম। তিনি আমার নাম ধরিয়া বলিলেন "গিরিশ, এখানে তোমার কেমন লাগে?"

"দিব্যি।"

"বটে? তা এখান থেকে তোমায় আর কোথাও যেতে ইচ্ছে হয় না?"

"কোথা যাব? এখানেই থাকবো!"

"তা বেশ" বলিয়া কালিদাস বাবু কপাল হইতে চশমা নামাইয়া ছাপার কাগজ পড়িতে লাগিলেন। কাগজের প্রথম পাতে একটী ছবি। আমার সেই সাহেব! আমি একটু আশ্চর্য্য হইলাম! অনেক দিন পরে কোন পরিচিত বন্ধুর সাক্ষাৎ পাইলে যেরূপ হয় আমারও সেইরূপ হইল। একটী ছোট কথা আমার মুখ দিয়া বাহির হইল; আমি বলিয়া উঠিলাম "আরে!" কালিদাস বাবু কাগজ নামাইয়া আমার মুখের দিকে চাহিলেন। তাহার অর্থ, ব্যাপারখানা কি?

আমি বলিলাম "আজ্ঞে ঐ ছবিটে!"

"ইনি একজন বড় লোক ছিলেন, তোমারও বড় লোক হইতে ইচ্ছে হয় না" আমি ভাবিলাম এই বুঝি! হঠাৎ প্রশ্ন হওয়াতে থত মত খাইয়া বলিলাম "বড় লোক কি সবাই হয়?"

"হয় বৈ কি? ইচ্ছে করলে তুমিও হ'তে পার।"

"আমি পারি?"

"অবিশ্যি। কাল থেকে তোমাকে ইস্কুলে পাঠিয়ে দিব ভেবেছি। লেখা পড়া না শিখ্‌লে বড় লোক হওয়া যায় না। তাই তোমাকে ডেকে ছিলাম। কেমন?"

আমার বাতাসের ঘর ভাঙ্গিয়া গেল। যার চোটে বাড়ী ছাড়া সেই আপদ! আমি কোন কথা কহিলাম না। কালিদাস বাবু এত সন্দেহ করেন নাই, সুতরাং কিছু বলিলেন না। এরূপ কথা বার্ত্তা কালিদাস বাবুতে আর আমাতে অনেকদিন হইত। তিনি আমার অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিতেন:—"সেই রাত্রিতে সেই নৌকায় কেমন করিয়া আসিলে?" "বাড়ী কোথা?" "মা-বাপ নাই?" ইত্যাদি,—আমি প্রায়ই চুপ করিয়া থাকিতাম। কালিদাস বাবুর ইচ্ছা ছিল সুযোগ পাইলে আমাকে বাড়ী পাঠাইয়া দিবেন। কিন্তু এ সব সম্বন্ধে কোন খবরই আমি তাঁহাকে দিতে চাহিতাম না, তখন তিনি সে বিষয়ে ক্ষান্ত হইয়া সেখানেই আমাকে লেখা পড়া শিখাইবার মনস্থ করিলেন।

ইস্কুলে যাইয়া অবধি আমার আর মনে শান্তি ছিল না। কয়েকদিন কোন মতে কাটাইলাম, কিন্তু শেষটা অসহ্য হইয়া উঠিল। কালিদাস বাবুর বাড়ীতে আর থাকা হবে না। কিন্তু হঠাৎ যাই কোথায়? গেলেও এবার আর হাঁটিয়া যাওয়া হবে না। কা—হইতে দুখানা ষ্টিমার ধু——তে যাতায়াত করিত। সপ্তাহে দুদিন ষ্টিমার চলে। ধু—— যাইতে তিন দিন লাগে। হিন্দুরা এই তিন দিনের চিঁড়ে পুটলী বাঁধিয়া লইয়া জাহাজে উঠে। ভোর বেলা কা—হইতে জাহাজ ছাড়ে।

একদিন নদীর ধারে বেড়াইতে যাইয়া দেখি একখানা ষ্টিমার এই মাত্র আসিয়া ঘাটে থামিল। পরের দিন ভোরে চলিয়া যাইবে। হঠাৎ ষ্টিমারে উঠিয়া ধু——চলিয়া যাইতে আমার বড় ইচ্ছা হইতে লাগিল। বাড়ী আসিয়া কেহ না দেখে এমন ভাবে আমার কাপড় চোপড় সব একত্র জড় করিলাম। কালিদাস বাবুর বাড়ী আসিবার কালে সঙ্গে করিয়া যে টাকা আনিয়া ছিলাম তাহার একটীও ব্যয় হয় নাই। কালিদাস বাবুও মাঝে মাঝে আমার ইচ্ছা মত খরচ করিবার জন্য দু একটী দিতেন। আমি সমস্তই সঞ্চয় করিতাম। শুনিয়া ছিলাম বড়লোকেরা সহজে টাকা খরচ করিতে চাহে না।

যাত্রার উপযোগী সকল জিনিষ প্রস্তুত রাখিয়া ঘুমাইলাম। মনে একটা চিন্তা থাকিলে সহজে ঘুম হয় না; ঘুম হইলেও শীঘ্রই ভাঙ্গিয়া যায়। আমারও তাই হইল। বড় কামরার ঘড়ীতে চারিটা বাজিল; আমি অমনি উঠিলাম। সঙ্গে পুটলীটী। পুটলীতে কয়েকখানা কাপড়; এক জোড়া চটী জুতা; নগদ কিছু টাকা; কালিদাস বাবু মাঝে মাঝে যে উপহার দিতেন সে গুলি——কয়েকখানা ছবি, একটা বড় ছবি;——আর আমার স্কুলের পুস্তক গুলি; পুস্তক গুলি কেন সঙ্গে লইলাম ঠিক বলিতে পারি না, তবে কালিদাস বাবু বলিয়াছিলেন "লেখা পড়া না শিখলে বড়লোক হওয়া যায় না," তাহাতেই মনে কেমন একটা ভয় রহিয়া গিয়াছিল। এইরূপ সাজ সজ্জা করিয়া, ছাতাটী হাতে করিয়া, বিছানার চাদর খানা পুটলীর উপরে জড়াইয়া লইয়া আস্তে আস্তে বাহির হইলাম। ষ্টীমার ঘাটে আসিতে অধিক ক্ষণ লাগিল না। সেখানেই মুদীর দোকান আছে, সেই দোকান হইতে চিড়ে কিনিয়া বিছানার চাদরের এক কোণে বাঁধিয়া লইয়া, জাহাজের একজন লোক আমাকে একটা যায়গা দেখাইয়া দিলে, আমি সেইখানে যাইয়া বসিলাম। জাহাজে বিশেষ কিছু ঘটনা হইল না। তবে সঙ্গে যে টাকা আনিয়াছিলাম তাহা প্রায় শেষ হইয়া আসিল। নিয়মিত সময়ে জাহাজ খু——পৌঁছিল। ক্রমশঃ।

ঠাকুরদাদার গল্প।

লমালের কারণ আরকিছুই নহে, একটী বেল পড়িয়া একটী ছেলের মাথা ফাটিয়া গিয়াছে, তাহারই বাপ মা কাঁদিতেছে। বালকেরা সেখানে একটুকু দাঁড়াইয়া নিজের যায়গায় ফিরিয়া আসিল। তখন নবীনবাবু বলিতে লাগিলেন "বোধ হয় তখনকার কথা এর মধ্যেই ভুলে যাও নাই; জড়বস্তুর যদি দুইটী গুণ অর্থাৎ নিজে চলিতে পারে না এবং একবার চলিলে নিজে থামিতে পারে না, এই দুটী গুণ না থাকিত, তাহা হইলে যে কি হইত তাহা মনেও ধারণা করা যায় না। এখন একটা তীর খুব জোরে ছুড়িয়া দিলেও পৃথিবীর আকর্ষণে ও বায়ুর বাধা লাগিয়া শীঘ্র উহা থামিয়া মাটীতে পড়ে। সকল বিষয়েই ঐরূপ নিয়ম। এখন বুঝিতে পারিবে নলিনের দড়ী বাঁধা ঢিল ঘুরিতেছে কেন? ঢিলটীকে পৃথিবী আকর্ষণ করিতেছে, নলিন কিন্তু উহা ছুড়িয়া ফেলিল, দড়ী না থাকিলে এক দিকে ছুটিয়া গিয়া মাটীতে পড়িত, তাহা হইল না, দড়ী উহাকে যাইতে দিল না, নলিনের হাতের দিকেই টানিয়া রাখিল, ঢিলটীও কিন্তু ফি বার বাহিরের দিকে পলাইতে চেষ্টা করিতেছে দড়ীও যাইতে দিবে না,—কাজেই বেচারা মহা বিপদে পড়িয়া ঘুরিতেছে। যেমন একটা ঘোড়াকে দড়ীতে বাঁধিয়া চাবুক মারিলে সে পালাইতে চায় কিন্তু না পারিয়া কেবল চারি দিকে গোল হইয়া ঘোরে এও সেইরূপ। কেমন, সকলে বুঝিয়াছ কি? (সকলে "হাঁ।")

"এইবার এই সহজ কথাটী হইতে আজ একটি বড় কথা বুঝাইয়া দিব। আচ্ছা আগে বল দেখি পৃথিবী যে রহিয়াছে, কিসের উপর?" ননুবাবুঃ—"আমি জানি। এই, বাসুকী এক হাজার ফণা দিয়ে মাথায় করিয়া আছেন।" সকলেঃ—"হাঁ, আমরাও তাই জানি" বিনয়ঃ—"আমার কিন্তু সে সব বিশ্বাস হয় না।" কিশোরীঃ—"আমারও হয় না। আমি একদিন আপনাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিব মনে করিয়াছিলাম।" নবীন বাবু হাসিয়া বলিলেনঃ—"এই সহজ কথাটী বুঝিতে পারিলে না? ভাল বাসুকী যদি এত বড় প্রকাণ্ড পৃথিবী মাথায় করিয়া আছে তবে সে বাসুকীর খুব ক্ষমতা সন্দেহ নাই। বেশ, কিন্তু তাহাকে কে মাথায় কোরে আছে? সে কোথায় আছে, কিসের উপর?"

সকলেই মুখ দেখাদেখি করিয়া লজ্জিত হইল। বিনয় ও কিশোরী হাসিতে লাগিল। নলিন একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল "তা আমি অতো জানি না, ছোট পিসী আমায় যেমন বলিয়া দিয়াছেন তাই মনে আছে।" নবীন বাবুঃ—"ওসব ভুল কথা শুনিওনা। পৃথিবী যে গোল, ইহার কি আবার পাতাল আছে না বাসুকী আছে? ইহা শূন্যময় আকাশে ঝুলিতেছে। যেমন একটা সুতাতে একটা গোল ভাঁটা ঝোলে সেইরূপ সূর্য্যের আকর্ষণে শূন্যে ঝুলিয়া আছে। দেখ আকর্ষণ কেমন দরকারী, ইহা না থাকিলে কি হইত? তোমরা জান সূর্য্য পৃথিবী অপেক্ষা ১৪ লক্ষ গুণে বড়, সুতরাং যে বড় তারই আকর্ষণ বেশী, এজন্য উহার টানে পৃথিবী ঝুলিতেছে। যেমন এক খণ্ড চুম্বকের টানে একটা লোহার বাঁটুল আমার বড় ঘরে ঝোলান আছে, এও ঠিক সেইরূপ।"

"কেবল তাহা নহে, পৃথিবী ঐ ঢিলটীর মত কেবলই এক দিক পানে চলিয়া যাইতে চাহে, কিন্তু সূর্য্য তাহাকে সে দিকে যাইতে দিবে না, জোরে টানিয়া আছে। সুতরাং নলিনের ঢিলের মত ক্রমাগত পশ্চিম দিক হইতে পূর্ব্ব দিকে সূর্য্যের চারি দিকে গোল হইয়া ঘুরিতেছে, ইহাকেই পৃথিবীর 'বার্ষিক গতি' বলে। ৩৬৫ দিনে পৃথিবী একবার সূর্য্যের চারিদিক এইরূপে ঘুরিয়া আসে। ইহাও ঠিক ঐ ঢিলের মত। পৃথিবী যেন ঐ ঢিলটী আর সূর্য্যের আকর্ষণ যেন ঐ দড়ীটা।" সকলে আশ্চর্য্য ও আনন্দে অবাক্ হইয়া রহিল; কেহ কেহ বলিলঃ—"এমন, তা জানি না। আমরা ভূগোলে পড়িয়াছি বটে, কিন্তু সে যে এই জন্য তা জানিতাম না; পণ্ডিত মহাশয়ও কিছু বলেন নাই। এইবার স্কুলে গিয়া সকলকে বলিব। নবীন বাবু আরও বলিলেনঃ—"আরও দেখ চন্দ্র ঠিক এইরূপে আবার পৃথিবীর চারি দিকে ঘুরিতেছে, এই চন্দ্রকে লইয়াই পৃথিবী সূর্য্যকে বেষ্টন করিতেছে, যেমন ঢিলটী ঘুরাইতে ঘুরাইতে নলিন আমার চারিধারে ছুটিতেছিল। চন্দ্র প্রায় এক মাসে পৃথিবীকে ঘোরে, এজন্য এক মাস অন্তর পূর্ণিমা হয়। সে যাহা হউক, পৃথিবী যে কত জোরে সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে, তাহা একবার বিবেচনা করিয়া দেখ—প্রতি সেকেণ্ডে পৃথিবী প্রায় এক হাজার ক্রোশ পথ চলিতেছে! নলিন যেমন একটুখানি বালক, উহার ঢিল তেমনি একটুখানি, তাহার বেগও তেমনি অল্প। সূর্য্য যেমন প্রকাণ্ড পদার্থ, উহার পৃথিবীও তদুপযুক্ত, ইহার বেগও তেমনি ভয়ানক! তথাপি পৃথিবী যেমন একটী তেমনি আরও কত শতটী 'গ্রহ' সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে নিয়ত প্রদক্ষিণ করিতেছে। উহার কি ভয়ানক আকর্ষণ শক্তি!

বিনয়ঃ—"পৃথিবীর আহ্নিক গতিটা কিরূপ?"

নবীন বাবুঃ—"সে ত অতি সহজ। যেমন একটা গোলা মনে কর আর একটা গোলার চারিদিক বেষ্টন করিতেছে, সে নিজে দুরকমে চলিতে পারে। এক মাটীতে ঘসিয়া ঘসিয়া, তাহাতে গোলাটীর কেবল এক দিকই মাটীতে ঠেকিয়া রহিবে। আর এক, গড়াইয়া গড়াইয়া গাড়ীর চাকার মত, তাহাতে সব দিক একবার করিয়া উপরে একবার নিচে আসিবে বুঝিলে? পৃথিবী দ্বিতীয় প্রকারে চলে। একটা মাটীর গোলার ভিতর দিয়া সরু একটী কাটি চালাইয়া দাও, পরে সেই কাটিটীতে পাক দিলে তার সঙ্গে গোলাটীও ঘোরে, এইরূপ ঘোরাকে "আপন মেরুদণ্ডে ঘোরা" বলে, ঐ কাটির নাম মেরুদণ্ড। পৃথিবীরও উত্তর দিক হইতে দক্ষিণ দিক পর্য্যন্ত যদি একটী ঐরূপ প্রকাণ্ড কাটি আছে মনে করা যায়, সেইটীর নাম উহার মেরুদণ্ড; এই মেরুদণ্ডে যেন কেহ পাক দিতেছে, তাই ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পৃথিবী একবার গড়াইতেছে, এজন্য সূর্য্য ও নক্ষত্রগণকে পূর্ব্ব দিকে উদয় ও পশ্চিমে অস্ত যাইতে দেখা যায়। গাড়ীর চাকা যেমন গড়াইতে গড়াইতে অনেক দূর যায়

পৃথিবীও তদ্রূপ আপনা আপনি গড়াইতে গড়াইতে সেই সঙ্গে সূর্য্যের চারিদিক বেষ্টন করিতেছে।"

কিশোঃ—"সবই বুঝিয়াছি, কিন্তু আমার একটী সন্দেহ আছে। যখন রেল গাড়ীতে যাই, তখন যদি জানালা দিয়া মুখ বাড়াই, তাহা হইলে বাতাসের জোরে যেন পড়িয়া যাইব ভয় হয়, আর তখন যদি কেহ ছাতে গিয়া দাঁড়ায় তবে সে নিশ্চিত পড়িয়া যাইবে। কিন্তু যখন পৃথিবী ফি সেকেণ্ডে ১০০০ ক্রোশ পথ ছুটিতেছে, রেলের চেয়ে কত হাজার হাজার গুণ জোরে, তখন আমরা ছুড়িয়া পড়ি না কেন? আর বাতাসই বা সে রকম তেজে গায়ে লাগে না কেন?"

নবীন বাবু—"বেশ বলিয়াছ, এ প্রশ্ন হওয়াই স্বাভাবিক, তুমি ত বালক, বড় বড় পণ্ডিতেরাই এ কথা তলাইয়া বুঝেন না। ভাল, রেলের গাড়ীর ভিতরে যখন বসিয়া থাক তখন ছুড়িয়া পড় না কেন? তখনই বা বাতাসের অত তেজ হয় না কেন?" (কিশোঃ—"বলিতে পারি না") এইটী বুঝিতে পারিলেই ঠিক হইবে। গাড়ীর ভিতরে বসিলে বায়ুর গতি অনুভব করা যায় না তাহার কারণ এই যে গাড়ীর ভিতরে যে বাতাস আছে তাহা গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গেই চলে; ছাতের উপরে তু তাহা নহে, সেখানকার বাতাস গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে চলে না কাজেই তাহাদের তেজে পড়িয়া যাইতে হয়। পৃথিবী আমাদিগকে যেমন আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছে, গাছ, বাড়ী, পুকুরে, নদীতে ও সমুদ্রে জল রাখিয়াছে, সেইরূপ বাতাসকেও ত আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছে। কদম্ব ফুলের গায়ে পাপড়ী গুলি যেরূপ থাকে, আমাদের মাথায় চুল যেরূপ থাকে, মণ্ডলাকার পৃথিবীর গায়ে ৫০ মাইল ব্যাপিয়া বায়ুরাশিও ঠিক সেইরূপ আছে। ইহাও পৃথিবীর সঙ্গে ঘুরিতেছে সেই জন্য আমরা বায়ুর জোর টের পাই না, আর পৃথিবী আমাদিগকে টানিয়া রাখিয়াছে বলিয়া পড়িয়া যাই না। বুঝিলেত? আরও অনেক কথা আছে, বড় হইয়া যখন পড়িবে তখন জানিতে পারিবে। চল আজ বাড়ী যাই, বড় হিম পড়িতেছে।" নলিন—"আমাকে তোমরা খাবার দাও, ভাগ্যিস্ আমি ঢিল ঘুরাইতেছিলাম তাইত এত নূতন কথা শিখিলে?" সকলে হাঁসিলেন। অমূল্য:—"নলিন, ছোট পিসীকে আজ গিয়া জিজ্ঞাসা করিও, বাসুকী কিসের উপর থাকে?" বিনয়:—"তা তিনি বলিবেন 'দেবতা যে বাসুকী'।" সকলে হাসিতে হাসিতে গৃহাভিমুখে চলিলেন। মন্মথ—"দাদা মহাশয়, এবার হিম পড়ে কেন, আমি শুনিব, জানিনা। আররারে তাই বলিবেন কি?"

শ্বেত ভল্লুক।

উপরে যে জন্তুর নাম দেখিতেছ, তাহা কিরূপ জান কি? এই প্রাণী কি তোমরা কখন দেখিয়াছ? না দেখ নাই। ল্যাপল্যাণ্ড, উত্তর রুসিয়া প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশেই ইহারা বাস করে। আমাদের ভারতবর্ষের ন্যায় গরম দেশে ইহারা বাঁচে না। ইহারা খুব মোটা, আকারে এদেশী ভালুকেরই মত, কিছু বড়ও হয়। ইহাদের সর্ব্ব শরীর বড় বড় শাদা লোমে ঢাকা। ইহাদের চক্ষু ছোট ছোট, ও পায়ের তলায় এক এক গোছা বড় বড় পুরু লোম হয়। সচরাচর ইহারা নদী, হ্রদ বা সমুদ্র হইতে বড় বড় মাছ ধরিয়া খায়, আর যখন তাহা না পায় তখন অন্যান্য জন্তু খাইয়াও বাঁচে। আর কিছু না পাইলে অবশেষে ছোট ছোট গাছ পালাও খাইয়া থাকে।

পরম করুণাময় পরমেশ্বরের রাজ্যে কাহারও অসন্তোষের কারণ নাই। তিনি মনুষ্যকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব করিয়া কত বুদ্ধি দিয়াছেন, মানুষ সেই বুদ্ধিবলে সকল অভাব দূর করিতেছে ও কত নূতন নূতন সুখ স্বচ্ছন্দতার উপায়

বাহির করিতেছে। ঘোরতর গ্রীষ্ম, যেখানে রৌদ্রে মাটি ফাটিয়া যাইতেছে,মানুষ সেখানে ছাতা, পাখা, খসখসী, বরফ-জল প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া গ্রীষ্মের যন্ত্রণা হইতে রক্ষা পাইতেছে। আবার যেখানে ভয়ানক শীত নদী, হ্রদ, সাগরাদি জমিয়া বরফের রাস্তা ও বরফের মাঠ হইয়া থাকে, সেই ভয়ানক স্থানেও বনাত,কম্বল,অগ্নিকুণ্ড প্রভৃতি উপায় করিয়া শীতের দৌরাত্ম্য অনেক পরিমাণে কমাইয়া নির্ব্বিঘ্নে কাল কাটাইতেছে। কোথাও লাঙ্গল লাগাইয়া ও বীজবপন করিয়া পৃথিবী হইতে শস্য জন্মাইয়া সুখে আহার করিতেছে, কোন স্থানে বা ধনুর্ব্বাণ অথবা গুলি বারুদের সাহায্যে নানাবিধ পশু বধ করিয়া মাংসদ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। স্থান বিশেষে বা ঋতু বিশেষে তাহাদের সুখের কোন ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে না। কিন্তু পরমেশ্বর ত ইতর জন্তুদিগকে এত বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তি প্রদান করেন নাই। তিনি কি নিষ্ঠুর? কেবল কষ্ট দিবার জন্যই কি ইতর প্রাণীদিগকে সৃজন করিয়াছেন?—ছিছি!! বালকগণ! কখন এরূপ ভাব মনে স্থান দিয়া অপরাধী হইও না। তাঁহার দয়ার চোখে সবাই সমান। তিনি ইতর জন্তুদিগকে মনুষ্যের ন্যায় এত বোধশক্তি দেন নাই সত্য, কিন্তু, তাহাদিগের জন্য প্রত্যক্ষ সকল এ প্রকার কৌশল ও দয়ার সহিত গঠিত করিয়াছেন যে, তাঁহাকে অপার করুণাময় না বলিয়া থাকা যায় না।

এই শ্বেত ভালুকেরা ভয়ানক শীতল দেশের নিবাসী, এই জন্যই পরমেশ্বর ইহাদের সর্ব্ব শরীর ঘন লোমে ঢাকিয়া দিয়াছেন। ইহাদিগকে সর্ব্বদা বরফের উপরেই চলিতে ফিরিতে হয়, এই জন্যই ইহাদের পায়ের তলায়ও এক এক গোছা লোম দিয়াছেন। আমাদের দেশীয় ভল্লুকদিগের সেরূপ নাই। আরও দেখ—ইহাদের বর্ণ যদি কাল হইত তাহা হইলে ইহারা কখন প্রাণ ধারণ করিতে পারিত না। আপাততঃ এ কথাটী যেন ঠিক নহে বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই জানিতে পারিবে যে কথাটী সত্য। উত্তর কেন্দ্রের সন্নিকটস্থ দেশ সকলে ভয়ানক শীত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি তথায় বরফই প্রধান পদার্থ, এবং এই বরফের নিম্নস্থ জলের মধ্যে যে সকল মৎস্য বেড়ায় তাহারাই বাহিরে আসিয়া পড়িলে এই ভালুকের আহার হয়। সাদা রঙ্গের বরফ রাশি চারিদিকে স্তূপাকারে রহিয়াছে, তাহা দেখিয়া দেখিয়া মাছেদেরই অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, তাহারা নির্ভয়ে মধ্যে মধ্যে এই বরফ স্তূপের উপরে বা পার্শ্বে রৌদ্র ও বায়ু সেবনের জন্য আসিয়া থাকে। ভল্লুকেরা এই বরফের মধ্যে আপনাদের শরীরের

বর্ণ মিলাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, মৎস্যাদি বাহির হইলেই অলক্ষিত ভাবে গিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ ও নষ্ট করে। যদি ইহাদের বর্ণ অন্যরূপ হইত তাহা হইলে শ্বেত বরফের গায়ে সুস্পষ্ট দেখা যাইত, সুতরাং মৎস্যেরাও তাহা দেখিয়া প্রাণ ভয়ে পলায়ন করিত। এইরূপে পুনঃ পুনঃ মাছ ধরিতে না পারিয়া কাল বা অন্য রঙ্গের ভল্লুককে অবশেষে অনাহারে নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিতে হইত। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্যই দয়াময় বিধাতা ইহাদিগকে শ্বেত বর্ণের করিয়া দিয়াছেন। আহা! তাঁহার করুণা অপার, মহিমা অতুল! তাঁহার ক্রিয়া কলাপ আমরা যতই পর্য্যালোচনা করি ততই আশ্চর্য্যান্বিত হই, ততই তাঁহার অসীম বুদ্ধি কৌশল ও দয়ার প্রমাণ দেখিয়া মোহিত হই!

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ফুল।

একজন বড় মানুষের স্ত্রী ফুল বড় ভাল বাসিতেন। কিন্তু সমুদায় ফুলের মধ্যে আবার গোলাপ ফুলই অধিক ভাল বাসিতেন, নানা দেশের নানা রকমের অতি সুন্দর সুন্দর গোলাপ ফুলের গাছ তাঁহার বাগানে ছিল। তাঁহার বাড়ীর চারিধারে অতি মনোহর নানা বর্ণের ফুল ফুটিয়া থাকিত। কিন্তু এত শোভা, এত ফুলের বাহারের মধ্যেও হায়! হায়! তাঁহার রাজার ঘরে দুঃখ, পাপ ও যন্ত্রণা সর্ব্বদাই বাস করিত। এক দিন এই সুন্দর গৃহের মধ্যে তিনি অতি সাংঘাতিক পীড়ায় শয্যাগত হইলেন। তাঁহার চিকিৎসা হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে সমুদয় চিকিৎসকই তাঁহার জীবনের আশা পরিত্যাগ করিলেন। সকলেই বলিতে লাগিলেন তাঁহার জীবনের আশা করা বৃথা। তিনি আর এ যাত্রা রক্ষা পাইবেন না। তাঁহাদের মধ্যে একজন সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানী লোক বলিলেন, "এখনও ইহাঁর জীবন রক্ষার এক উপায় আছে। পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা যে ফুল সুন্দর ও যাহা সর্ব্বদা পবিত্র ও উজ্জ্বল থাকে এমন ফুল যদি ইহার চক্ষের সম্মুখে ধরা যায় তাহাহইলে কখনই ইহাঁর মৃত্যু হইবে না।" এই কথা শুনিয়া নানা দেশের নানা লোক আপন আপন বাগানের সুন্দর সুন্দর গোলাপ আনিল। কিন্তু কোনটাই ঠিক মনের মত হইল না। এ ফুল ভালবাসার বাগান হইতে তুলিতে হয়; গোলাপটী যেন সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র ও উচ্চ ভালবাসায় গঠিত হয়। জ্ঞানী লোকটী অবশেষে বলিলেন, "কেহই যথার্থ ফুলের নামটী করেন নাই। কোথায় এ ফুল ফোটে তাহাও কেহ বলেন নাই। এ পুষ্প মহা ধার্ম্মিক লোকদিগের শ্মশানে প্রস্ফুটিত হয়। এ ফুল কখন শুকায় না, কখন ঝরিয়া পড়ে না।" একজন মহিলা হাসিতে হাসিতে ফুলের মত আপনার সুন্দর ছেলেটীর হাত ধরিয়া রোগীর শয্যা পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন। তিনি ফুলের কথা শুনিয়া বলিলেন "আমি জানি কোথায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গোলাপ আছে—আমার এই বাছার লাল গালদুটী যেন গোলাপ ফুটিয়া আছে। যখন ললিত আমার শৈশবের পবিত্র ও নির্ম্মল ভালবাসা দেখায়, আর যখন ঘুম থেকে ঐ সরলতা-মাখা বড় বড় চক্ষু দুটী তুলিয়া আমার মুখ পানে চাহিয়া শৈশবের পবিত্র হাসি হাসে, আমি তখনই দেখি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ফুল তাহাতেই ফুটেছে;—এই আমার নির্ম্মল ফুল।" তখন জ্ঞানী-ব্যক্তি উত্তর করিলেন, "হাঁ, ইহাও একটী অতি মনোহর ফুল বটে; কিন্তু আরও একটী ফুল আছে যাহা ইহা অপেক্ষাও সুন্দর।" আর একটী রমণী বলিলেন "আমি একটী ফুল দেখিয়াছি যাহা এই সুন্দর ফুলটীর চেয়ে আরও মনোহর, সেই ফুল এই।" এই বলিয়া শয্যাগতা রোগকাতরা স্ত্রীলোকটীকে দেখাইয়া দিলেন। "ইহা অপেক্ষা সুন্দর ফুল আর ফোটে না; আমি দেখি-

য়াছি যখন ইনি আপনাব সমুদায় সুন্দর সুন্দর বসনভূষণ খুলিয়া ফেলিয়া আপনার প্রাণের পীড়িত সন্তানকে বুকে ধরিয়া সমুদায় রাত্র কেবল চোখের জলে বুক ভাসাইয়াছেন, এবং ভগবানের নিকট "তুমি যা কর, ভগবান!" এই বলিয়া পুত্রের সুকোমল মুখখানি চুম্বন করিয়াছেন।—আমি তখনই দেখিয়াছি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ফুল এই বাটীতেই ফুটিয়াছে।" "এই যে ফুল ইহাও চমৎকার কিন্তু বাস্তবিক শ্রেষ্ঠ ফুল ইহাও নয়।" তখন একজন ধার্ম্মিক বৃদ্ধ লোক বলিলেন "এক গরিবের কুটীরে দেখিয়াছি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ফুল বাস্তবিকই সেখানে ফুটিয়াছে। আমি দেখিয়াছি যখন সেই পবিত্র ফুলটী প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে হাত দুখানি যোড় করিয়া চক্ষু দুটি মুদিয়া ঈশ্বরের পূজাতে নিযুক্ত থাকে তখন সেই বালিকার পবিত্র মুখখানিতে স্বর্গের শোভা প্রস্ফুটিত হয়; আমার তখনই মনে হয় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ফুল বুঝি এই। সেই ফুলটী বাস্তবিকই নির্ম্মল, পবিত্র প্রেমের ছবি। ঈশ্বর এই বালিকাকে আশীর্ব্বাদ করুন! কিন্তু এখনও কেহই সেই ফুলটীর নাম করেন নাই।" সেই সময় গৃহের মধ্যে একটী অতি সুন্দর বালক আসিয়া উপস্থিত হইল। এই বালকটীই পীড়িতা রমণীর বত্স। সে ছলছল চক্ষে মাকে বলিল, "মা, আমি তোমাকে এই সুন্দর বই হইতে একটু পড়িয়া শুনাই।" এই বলিয়া সে একখানি পুস্তক হইতে করুণাময় পরমেশ্বরের মহিমা পড়িয়া শুনাইল। আর এই কথাগুলি শুনিবামাত্র তাহার মায়ের মুখখানি লাল হইয়া উঠিল। সেই কথা গুলি এই—

" করুণাময় দেবতা আমাদের ইহকাল পরকালের একমাত্র গতি, আর অন্য গতি নাই।"

তখন তাহার মাতা বলিলেন "আমি দেখিয়াছি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ফুল কোথায়; এই কথা গুলির ভিতর সেই শ্রেষ্ঠ ফুল ফুটিয়াছে। যে এ ফুল দেখিয়াছে সেই অমর, তাহার মৃত্যু নাই।"

ঐতিহাসিক গল্প।

প্রথম গল্প।

যোগীন বাবু বিকাল বেলা ছাদে বসিয়া একখানি বই পড়িতেছেন। সরলা, বিমলা, তরলা, প্রমীলা, নরেন, সুরেন, ব্রজেন আসিয়া "দাদা দাদা" বলিয়া তাঁহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল। যোগীন বাবুর তিনটী বোন ও তিনটী ভাই। বোনদের মধ্যে সরলা সকলের বড়, তার বয়স ১৪ বৎসর। নরেন সরলার ছোট তার বয়স ১৩ বৎসর। প্রমীলা সকলের ছোট তার বয়স সাত বছর। ইহারা সকলেই দাদাকে বড় ভাল বাসে। দাদাও ভাই বোন সকলকে বড় ভাল বাসেন। প্রতিদিন বিকালবেলা যোগীন বাবু কালেজ হইতে আসিলেই ইহারা সকলে গিয়া তাঁহার মুখে নানা প্রকারের সুন্দর সুন্দর গল্প শুনে। আজও গল্প শুনিবার জন্য সকলে গিয়া তাঁহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল। সরলা দাদার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া অতি যত্নের সহিত তাঁহার চুলগুলি গুছাইয়া দিতে লাগিল। বিমলা তাঁহার দাড়ি ধরিয়া আদর করিতে লাগিল, তরলা তাঁহার একপাশে দাঁড়াইয়া জামার হাতের বোতামটা একবার খুলিয়া আবার বন্ধ করিতে লাগিল। প্রমীলা তাঁহার বাম হাতের অঙ্গুলগুলি লইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া অন্য মনে খেলা করিতে লাগিল। নরেন, সুরেন ও ব্রজেন তাঁহার পায়ের নিকটে আসিয়া ধপ করিয়া বসিয়া পড়িল। সকলেই "দাদা গল্প বল, গল্প বল" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। যোগীন বাবু হাসিয়া হাসিয়া সকলের মুখের দিকে একবার তাকাইয়া বলিলেন,—"কি গল্প শুনিবে বল দেখি?" প্রমীলা বলিয়া উঠিল,—"সেই বাঘের গল্প বল, দাদা।"

তরলা বলিল,—"না দাদা, সেই জঙ্গলে একটা ছেলে খুড়েছিল, ঐ গল্পটা বল।"

সরলা বলিল,—"না দাদা, একটা নূতন গল্প বল।"

তখন সুরেন, নরেন, তরলা বিমলা, সকলেই বলিল,—"বেশ দাদা! আজ একটা নতুন গল্প বল।"

যোগীন বাবু বলিলেন, 'আচ্ছা তবে তোমরা বসো।"

এই কথা শুনিয়া সকলেই যোগীন বাবুর সুমুখে গিয়া বসিল। কেবল সরলা দাদার অনুমতি লইয়া তাহার পাশে তাহার হাতটি ধরিয়া দাঁড়াইয়া গল্প শুনিতে লাগিল।

যোগীন বাবু বলিতে লাগিলেন :—"আচ্ছা বল দেখি এ বাড়ী কার?"

সকলে এক সঙ্গে বলিয়া উঠিল,—"আমাদের।"

যোগীন,—"এ পাড়া কার?"

সকলে,—"আমাদের।"

যোগীন বাবু,—"যেমন আমাদের বাড়ী আছে, যেমন আমাদের পাড়া আছে, তেমনি আমাদের একটা গ্রাম আছে ও তেমনি আমাদের একটা দেশও আছে। অনেকগুলি বাড়ীতে একটা পাড়া হয়, অনেকগুলি পাড়াতে একটা গ্রাম হয়, অনেকগুলি গ্রামে একটা জেলা হয়, অনেকগুলি জেলাতে একটা ছোট দেশ হয়, তাহাকে প্রদেশ বলে। আর অনেকগুলি প্রদেশে একটা দেশ হয়। আমাদের দেশ খুব বড়। তাহার নাম তোমরা জান কি?"

নরেন বলিল,—"জানি বই কি? আমাদের দেশের নাম ভারতবর্ষ।'

তখন বিমলা, তরলা ও সুরেনও এক সঙ্গে বলিয়া উঠিল,—"ভারতবর্ষ, জানি বই কি?"

যোগীন বাবু তখন আবার বলিতে লাগিলেন,—"এই ভারতবর্ষ আমাদের দেশ। আমাদের পাড়াকে, আমাদের গ্রামকে যেমন আমরা বেশী ভাল বাসি, এই দেশকেও তেমনি আর আর দেশের চাইতে আমরা বেশী ভাল বাসি। আমাদের বাড়ীর লোকেরা যেমন আমাদের আপনার লোক, তেমনি আমাদের যে দেশ সেই দেশের লোকেরাও আর আর দেশের লোকের চাইতে আমাদের বেশী আপনার লোক। যে ভারতবর্ষের লোক সেই আমাদের ভাই, তাহাকেই আমাদের আপনার ভাইয়ের মত আদর করা উচিত।"

"এই ভারতবর্ষ এখন আমাদের আপনার দেশ হইয়াছে, কিন্তু তিন চার হাজার বছর আগে ইহা আমাদের দেশ ছিল না। তখন এই দেশে আর এক জাতের লোক ছিল। তারা বড় অসভ্য ছিল। কাঁচা মাংস খাইত, বনে বনে থাকিত। তারা ভাল করিয়া ঘর বাড়ী বাঁধিতে জানিত না, কাপড় পরিতে জানিত না, চাষ করিতে জানিত না। তারা অতি অসভ্য ছিল। আজ কাল আর এ দেশে সে জাতের লোক বেশী নাই। কেবল কোনও কোনও পাহাড়ে তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। নাগা, কুকী, সাঁওতাল, ভিল, এই যে সকল অসভ্য জাতি পাহাড়ে আছে, ইহারাই সেই আগেকার অসভ্য লোকদিগের এক জাত।"

"হাজার হাজার বছর পূর্ব্বে আমাদের জাতের লোকেরা আর এক দেশে বাস করিতেন। সে দেশ ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমে, অনেক দূরে। এক বাড়ীতে খুব বেশী লোক হইলে যেমন বাড়ীর লোকেরা দুভাগ হইয়া দুটো বাড়ী করে, তেমনি একই দেশে যদি কখনও খুব বেশী লোক হয়, তখন সেই দেশের লোকেরা দলে দলে আর আর দেশে যাইতে আরম্ভ করে। আমাদের আগেকার দেশের লোকেরাও এই জন্য দলে দলে আর আর দেশে যাইতে লাগিলেন। একদল পশ্চিম মুখো গিয়া ইউরোপে ঘর বাড়ী বাঁধিলেন। সাহেবেরা এই দলেরই বংশের লোক। আর এক দল পারস্য দেশে

গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। আর আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা ভারতবর্ষে আসিয়া এই দেশের অসভ্য লোকদিগকে তাড়াইয়া দিয়া এই দেশ দখল করিলেন।"

সরলা বলিল,—"তবে দাদা, এ দেশ ত আমাদের নয়। আমরা আর এক জাতের দেশ জোর করিয়া কাড়িয়া লইয়াছি বইত নয়?"

যোগীন,—"হ্যাঁ, প্রথম প্রথম, এ দেশ আমাদের, এ কথা বলা যাইত না বটে, কিন্তু এখন এটা আমাদেরই হইয়াছে।"

সরলা,—"হ্যাঁ দাদা, জোর করে আর এক জনের জিনিষ কেড়ে নিলে তা কি কখনও আমার হতে পারে?"

যোগীন,—"প্রথম প্রথম এ দেশ আমাদের ছিল না সত্য, কিন্তু যখন আমরা এ দেশে ঘর বাড়ী বাঁধিলাম, তখন আমরাও সেই আগেকার অসভ্য জাতিদের সঙ্গে সঙ্গে এই দেশেরই লোক হইলাম। এই দেশ তাহাদের ও আমাদেরও, এখন আমরা সকলেই এই দেশের লোক।"

বিমলা জিজ্ঞাসা করিল,—"আচ্ছা দাদা, সাহেবেরাও কি এই দেশের লোক?"

যোগীন,—"না, সাহেবেরা আমাদের দেশের লোক নন, তাঁরা এ দেশে যদি ঘর বাড়ী বাঁধিয়া চিরকালের জন্য বসতি করিতেন, তাহা হইলে এ দেশের লোক হইতেন। এখন তাঁরা এ দেশে কাজ করিতে আসেন, কাজ শেষ হইলেই আবার আপনার দেশে চলিয়া যান, কাজেই সাহেবেরা আমাদের আপনার দেশের লোক নন— আজ আমাদের এই গল্পটা এখানেই শেষ হউক; রাত হয়েছে। তোমরাও এখন একটুকু পড়া শুনা কর গিযে।"

সকলেই তখন উঠিয়া দাঁড়াইল। যোগীন বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা বল দেখি আজ কি শিখিলে?" নরেন বলিল,—"আমি বলিব কি, দাদা?" বিমলা ও সরলা একসঙ্গে বলিয়া উঠিল "আমি বলিব, দাদা।"

যোগীন বাবু বলিলেন,—"আচ্ছা সরলা তুমি বল দেখি আজ কি গল্প হলো?" সরলা বলিল "এই ভারতবর্ষ আমাদের আপনার দেশ, এদেশের লোকদিগকে আমাদের ভাল বাসা উচিত, তাঁদের সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হওয়া উচিত। এই ভারতবর্ষ এখন আমাদেরই দেশ কিন্তু হাজার হাজার বছর আগে এদেশে নানা অসভ্য জাতের বাস ছিল। ভীল, সাওতাল, খাসিয়া, এরা সেই সকল জঙ্গলী জাতের সন্তান সন্ততি। হাজার হাজার বছর আগে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমে অনেক দূরে এক দেশে বাস করিতেন। সেখানে যায়গার অকুলান হওয়াতে তাঁরা দলে দলে সেই দেশ ছাড়িয়া আর আর দেশে যান। প্রথমে একদল পশ্চিম দিকে গিয়া ইউরোপে ঘর বাড়ী বাঁধেন। তাঁহারাই সাহেবদের পূর্ব্ব পুরুষ। তার কিছুদিন পরে আর একদল পারস্যদেশে যান। ও একদল ভারতবর্ষে ঢুকেন। ইঁহারাই আমাদের পূর্ব্ব পুরুষ।" যোগীন বাবু বলিলেন,—"বেশ হয়েছে, সকলে এসব কথা মনে রেখো। এখন পড়া শুনা কর গিয়ে।"

এই বলিয়া যোগীন বাবু ভাই ভগিনীদিগকে বিদায় করিয়া আপনার পড়িবার ঘরে গেলেন।

পাহারা ওয়ালার ভেল্কী।

একদিন একজন দারোগা ২৪ জন সিপাহি সঙ্গে করিয়া একটা বড় বাড়ী পাহারা দিতে গেলেন। বাড়ীটাতে ৯টী কামরা, দারোগা সাহেব একবার সব কামরা গুলি ঘুরিয়া আসিয়া তাঁহার সিপাহি দিগকে ডাকিয়া প্রত্যেক পাশের কামরায় তিন জন করিয়া লোক রাখিয়া মাঝখানের কাম-

বায় আপনি নিজে গিয়া বসিলেন। তাঁহার মনে এই বন্দোবস্তে বড়ই আনন্দ হইল। প্রতি দিকেই নয় জন করিয়া সিপাহি আর তিনি আপনি মাঝখানে,—বাড়ী

৩	৩	৩
৩	দারোগা	৩
৩	৩	৩

রক্ষা করিবার আর ভাবনা কি? প্রাণের স্ফূর্ত্তিতে দারোগা সাহেব আপনার কামরায় গিয়া নাক ডাকিয়া ঘুমাইতে লাগিলেন। ক্রমে রাত্রি হইল, কিন্তু চোর ডাকাতের কোনও সাড়া শব্দ নাই, চুপটী করিয়া বসিয়া বসিয়া সিপাহিদিগের বড়ই বিরক্তি বোধ হইতে লাগিল। অবশেষে তাহারা দারোগা সাহেবকে জাগাইয়া গিয়া বলিল, —"মহাশয়, এক যায়গায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আমাদের পা ধরিয়া গিয়াছে, আপনি যদি হুকুম দেন তবে আমরা একবার স্থান-পরিবর্ত্তন করি।" ঘুমের ঘোরে থাকিয়াই দারোগা সাহেব বলিলেন, "তাহাতে আমার আপত্তি নাই, তবে প্রত্যেক দিকে নয় জনা করিয়া লোক থাকা চাই।" দারোগার হুকুম পাইয়া সিপাহিরা বাহিরে আসিলে তাহাদের একজন বলিল, "ভাই যদি এইরূপ দাঁড়াইয়াই পাহারা দিতে হয় তবে আর যায়গা বদল করিয়া লাভ কি? চল আমরা চার জন বাহিরে যাই, আর আমি প্রত্যেক দিকে নয় জন করিয়া সাজাইয়া দিতেছি।" এই বলিয়া সে এইরূপ করিয়া লোক গুলাকে দাঁড় করাইল:—

৪	১	৪
১		১
৪	১	৪

ইহাতে প্রতি দিকে নয় জন করিয়া রহিল, অথচ সর্ব্বশুদ্ধ চারি জন লোক কমিয়া গেল। দারোগা সাহেব কিয়ৎক্ষণ পরে বাহিরে আসিয়া লোক গণতি করিলেন। সব দিকেই নয় জন আছে দেখিয়া তাঁর বড়ই আনন্দ হইল। প্রাণের স্ফূর্ত্তিতে আবার আপনার কামরায় গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া ঘুমাইলেন।

কিছুকাল পরে যে চারি জন সহরে বেড়াইতে গিয়াছিল, তারা আরো চার জন লোক সঙ্গে করিয়া এই বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং ২৮ জন মিলিয়া পাহারা দিতে লাগিল। ঘণ্টা খানিক পরে দারোগা সাহেব আবার বাহিরে আসিয়া দেখিলেন লোকগুলি এই ভাবে দাঁড়াইয়া আছে:—

২	৫	২
৫		৫
২	৫	২

প্রত্যেক দিকেই নয়জন লোক আছে দেখিয়া দারোগার প্রাণে বড়ই আনন্দ হইল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন—"আহা আমার কি ভাগ্য! প্রত্যেক দিকেই নয়জন লোক আছে। এমন বিশ্বস্ত সিপাহী আমার অধীনে পাইয়াছি!" এই ভাবিয়া দারোগা সাহেব আবার প্রাণের আহ্লাদে আপনার কামরায় গিয়া ঘুমাইলেন।

দারোগা সাহেব আপনার কামরায় গেলে পর সহর হইতে আরো চারি জন সিপাহি আসিয়া যুটিল—২৪ জনার স্থানে ৩২জনা হইল, কিন্তু এখনও প্রত্যেক দিকে নয় জনাই রহিল:—

১	৭	১
৭		৭
১	৭	১

কিয়ৎক্ষণ পরে আবার দারোগা সাহেব বাহিরে আসিয়া সব পরিদর্শন করিয়া গেলেন, কিন্তু চব্বিশ জনার স্থানে যে ৩২ জনা হইয়াছে ইহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। প্রত্যেক দিকেই নয়জনা আছে, আর ভাবনা কি?

কিছুকাল পরে আরো চারি জনা সিপাহি আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু এবারও তাহারা এমন ভাবে দাঁড়াইল, যে প্রত্যেক দিকে ঠিক নয় জনাই রহিল:—

০	৯	০
৯		৯
০	৯	০

এইরূপে বার বার দারোগা সাহেবকে ঠকাইতে পারিতেছে দেখিয়া, সিপাহিদিগের সাহস বাড়িল। তখন এক জন বলিল "চল ভাই এখন আমরা অর্দ্ধেক

সহরে বেড়াইতে যাই।" এই বলিয়া আঠার জন সহরে চলিয়া গেল। যে ১৮ জন সেই বাড়ীতে রহিল,—তারা এইরূপ ভাবে দাঁড়াইল, কাজেই প্রত্যেকদিকে নয় জনাই রহিলঃ—

৫	০	৪
০		০
৪	০	৫

দারোগা সাহেব ভোরবেলা আর একবার উঠিয়া তাহার লোক গণতি করিয়া দেখিলেন, সন্ধ্যাবেলা তিনি যেমন প্রত্যেক দিকে নয় জনা করিয়া সাজাইয়া ছিলেন, এখনও ঠিক তেমনিই প্রত্যেক দিকে নয় জনা আছে। তাহার ২৪ জনার মধ্যে যে ছয় জন নাই, দারোগা সাহেব এইটি বুঝিতে পারিলেন না।

কি করিয়া পাহারাওয়ালাগণ দারোগাকে ঠকাইল, তাহা বুঝিতে পারিয়াছ কি? কোণের ঘরগুলিতে যারা থাকে তাদের দুইবার করিয়া গণনা হয়। সুতরাং এই ঘরগুলিতে যত বেশী লোক থাকে সমস্ত বাড়ীতে তত কম লোক থাকে, আর এই ঘরগুলিতে কম লোক থাকিলে সমস্ত বাড়ীতে লোক সংখ্যা বেশী হয়।

এই গল্প হইতে আমরা কি শিখিলাম?—যাহা করিতে হয় খুব ভাল করিয়া তন্ন তন্ন করিয়া সবদিক দেখিয়া করিবে। নতুবা ভাসা ভাসা ভাবে কাজ করিলে দারোগা সাহেবের মত ঠকিতে হইবে।*

দাদা বাবুর খোস গল্প।

মি এক দিন চুপ করিয়া নিজের ঘরে বসিয়াছিলাম,—প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে। খোলা জানালা দিয়া সূর্য্যের লাল কিরণ একটু একটু ঘরে ঢুকিতেছে,—আমি তাহাই দেখিতেছিলাম, আর ছাই পাঁশ কত কি ভাবিতেছিলাম, এমন সময় স্বর্ণ, দেবেন্দ্র, কুমুদিনী, যতীন ও চারু দৌড়িয়া আমার ঘরে আসিল। আমার ভাই বোন গুলি আমাকে বড় ভাল বাসে। গল্প শুনিবার দরকার হইলেই "দাদা বাবু" "দাদা বাবু" করিয়া আমার নিকটে আসিয়া যোটে। আমিও যতদূর পারি নূতন নূতন গল্প বলিয়া সকলকে খুঁসী করি। আজ তাহারা হুড়মুড় করিয়া হঠাৎ আমার নিকট আসাতে আমি চমকিয়া উঠিলাম।

স্বর্ণ বলিল, "দাদা বাবু! তুমি মাথায় হাত দিয়া কি ভাব?"

কুমুদিনী বলিল—"কি আর ভাববেন? ভাবেন আমরা এলে কি গল্প বলবেন; তাই মনে মনে তোয়ের করে রাখেন?"

দেবেন্দ্র বড় তেজাল ছেলে; সে বলিল "দাদা বাবু সাহেবদের মারবার কথা ভাবেন।"

যতীন বলিল—"দাদা বাবু বিলাতে গিয়া নানা রকম কল তোয়ের করতে শিখে আসবেন, তাই ভাবেন।"

চারু ছোট ছেলে,—সে কিছুই বলিল না, কেবল বলিতে লাগিল,—"গল্প বল না, ও—দাদা বাবু!"

আমি সকলের কথাতেই হাসিলাম; পরে সকলকে আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কিসের গল্প বলিব?"

সকলেই বলিয়া উঠিল, "যা হয় নতুন একটা কিছু বল।" কেবল আমার "কুমুদিদী" বলিলেন,—'তোমার বাঘা কুকুরের কোন একটা নতুন কাণ্ডের কথা বল না?"

আমি তাহাতেই রাজি হইয়া বলিতে লাগিলাম :—"দেখ, আমি এর পূর্ব্বেই তোমাদের বলেছি আমার বাঘা কুকুরটার খুব বুদ্ধি আছে, এবং এর অনেক গল্পও বলেছি। কেবল দুটী গল্প এখনও বলা হয় নাই। আজ তার একটী বলিতেছি। আমি একদিন আমাদের গ্রাম ছাড়াইয়া আর এক গ্রামের মাঠে বেড়াইতে গিয়াছিলাম, বাঘা আমার

*এইটি ইংরাজী হইতে গৃহীত।

সঙ্গেই ছিল। বিকাল বেলা বাড়ীতে ফিরিয়া আসিতেছি, এমন সময় বাঘা রাস্তা দিয়া আগে আগে ছুটিতে লাগিল। বাঘা প্রায়ই এইরূপ করিত, কাজেই আমি সে দিকে বেশী মন দিলাম না। আমি আস্তে আস্তে চলিতে লাগিলাম, এমন সময় ছোট ছেলের কান্নার মত একটা শব্দ আমার কাণে আসিল। তখন দৌড়িয়া গিয়া দেখি বাঘা এক বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়াছে, সেই বাড়ীতে একটী ৩।৪ বছরের ছেলে একটী কাচের বাটিতে করিয়া দুধ খাইতে ছিল, এবং এক হাতে একটী "ঝুনঝুনি" বাজাইতে ছিল। আমি ঘরে ঢুকিয়া দেখিলাম তাহার কাচের বাটি পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং ছোট ছেলে বলিতেছে "দুষ্টু কুকুল্! বাঁদল কুকুল্! তোকে ঝুনঝুনি মাল্‌ব অকন্" আমি গিয়া বাঘাকে ফিরাইয়া আনিতেছিলাম, এমন সময় সেই ছেলেটীর মা ঘরে আসিলেন। আমি তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিয়া ভাঙ্গা কাচের বাটি ও দুধের দাম দিয়া চলিয়া আসিলাম। তোমরা হয়ত ভাবিতেছ বাঘা দুধ কাড়িয়া খাইতে গিয়াছিল, কিন্তু বাঘা সে রকম "লোক" নয়। বাঘা ছোট ছেলেটীকে দেখিয়া তার সঙ্গে "ভাব" করিতে গিয়াছিল, তাহাকে আদর দেখাইতে গিয়া তাহার গায়ে লাফাইয়া উঠাতেই ভয়ে ছেলেটীর হাত হইতে কাচের বাটি পড়িয়া ভাঙ্গিয়া ছিল।

এই ঘটনার পরে অনেক দিন গেল। একদিন আমি বাঘাকে সঙ্গে করিয়া নদীর ধারে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। সেখানে অনেক ছেলে মেয়ে যুটিয়াছিল। বাঘাকে দেখিয়া অনেকে আদর করিতে লাগিল, কেহ কেহ ত্যক্ত করিতেও ছাড়িল না। যাহারা আদর করে, বাঘা তাহাদিগকে দেখিয়া লেজ নাড়িল, আর যাহারা ত্যক্ত করে বাঘা তাহাদিগকে দাঁত দেখাইয়া তাড়াইয়া দিতে লাগিল। আমি দাঁড়াইয়া মজা দেখিতে লাগিলাম। এমন সময় কি একটা গোলমাল হইয়া উঠিল—শুনিলাম একটী ছোট ছেলে জলে পড়িয়াছে। আমি দৌড়িয়া সেই দিকে গেলাম, বাঘাও সঙ্গে ছুটিল। বাস্তবিকই একটা ছেলে নদীর স্রোতে হাবুডুবু খাইতে ছিল। আমি আঙ্গুলের দ্বারা বাঘাকে দেখাইয়া দিলাম। বাঘা আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া তখনই ঝাঁপাইয়া জলে পড়িল, এবং ছেলেটীর দিকে যাইতে লাগিল, আমিও জামা ও যুতো রাখিয়া বাঘার পেছনে পেছনে সাঁতার দিলাম। আমরা দুজনে ছেলেটীকে তীরে আনিয়া তুলিলাম। তখন দেখি ছেলেটী আর কেহই নয়, কিছুকাল আগে বাঘা যাহার কাচের বাটি ভাঙ্গিয়া ছিল, এ সেই ছেলে। তখন বাঘার আনন্দ দেখে কে? লাফাইয়া লাফাইয়া বাঘা ছেলেটীর চারধারে ঘুরিতে লাগিল। ছেলেটী চোখ খুলিয়া চারিদিকে তাকাইয়া বাঘাকে দেখিল, দেখিয়া চিনিতে পারিল, এবং বলিল "আল্ আমি তোমায় ঝুনঝুনি মাল্‌বনা।" বাঘা ছেলেটীর হাত চাটিতে লাগিল। তামাসা দেখিবার জন্য একদল লোক জমিয়া গেল। ছেলেটীর মাও খবর পাইয়া আসিলেন। বাঘা হাত চাটিতে লাগিল এবং এত আহ্লাদে লেজ নাড়িতে লাগিল যে তার অর্দ্ধেক শরীরটা লেজের সঙ্গে নড়িতে লাগিল। বোধ হয় সে মনে মনে এই বলিতেছিল—"আহা! তুমি যে আমাকে মার্‌তে চেয়েছিলে, আমি কি তা মনে করে রেখেছি! পরমেশ্বর যদি আমাকে ছেলে করে দিতেন, তা'হলে আমি দিন দিন ভাল হ'তাম, লোককে ভাল বাসিতাম, কারও মনে কষ্ট দিতাম না, এবং কেউ কোন দোষ করিলে সহজে ভুলে যেতাম।"

ছেলে বাঁচিয়াছে দেখিয়া আহ্লাদে মায়ের চোখে জল পড়িতে লাগিল। আনন্দে দলশুদ্ধ ছেলে মেয়ে হাততালি দিয়া উঠিল। আমি মনের সুখে বাঘাকে লইয়া ঘরে ফিরিলাম।

মদ্যপানের ফল।

(৩নং)

আজিকার ঘটনা সমস্তই সত্য। বিনয়দেব বাড়ীতে আজ কেন কান্নাব ধুম পড়িযাছে, বলিতে পাব? ঐ দেখ বিনয়ের মা কাঁদিতে কাঁদিতে হাতেব শাঁখা ভাঙ্গিযা ফেলিতেছেন। বিনয় শিশু, সেও সকলেব দেখা দেখি কাঁদিতেছে।

বিনযেব বাপ স্কুল কলেজে বড ভাল ছেলে ছিলেন, তিনি এণ্ট্রান্স পাশ কবিযা মেডিকাল কলেজে ভর্ত্তি হন। যথা সময়ে মন্মথ বাবু ডাক্তাবী পবীক্ষায় 'পাশ' হইযা ডাক্তাব হইলেন। তাঁহাব যেমন দয়া, ঔষধ পত্রেব জ্ঞানও তেমনি, কাজেই অল্পদিনেব মধ্যেই তাঁব খুব নাম হইল। মন্মথ বাবু দিন বাত্রি বোগী দেখিযা বেড়াইতেন, সময়ে নাওযা খাওয়া হইত না, বোগীবা তাঁহাব নামে এমনি আশা পাইত যে কিছুতেই তাঁহাকে ছাড়িত না। সাহেব মহলেও তাঁর বেশ নাম ছিল, সাহেবেরা তাঁহাব ব্যাবাম ভাল কবিবাব ক্ষমতা দেখিয়া তাঁহাকে অনেক সময়ে ডাকিত। এই সাহেবদের বাড়ীতে গিযাই মন্মথ বাবুব সর্ব্বনাশ হইল। তোমবা বোধ হয় জান যে সাহেব বিবিবা মদ খাইযা থাকেন। তাঁহাবা মন্মথ বাবুকে আদর করিযা মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করিতেন এবং অন্য দশটা খাবাবের সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু মদও খাইতে দিতেন। আমাদেব ডাক্তাব বাবু প্রথম প্রথম আপত্তি কবিতেন বটে, কিন্তু শেষে ভদ্রলোক-দিগের নিকট চক্ষু লজ্জায় পড়িয়া বাজি হইলেন—তাঁহার কপাল পুড়িল। অল্প অল্প করিয়া তিনি ভয়ানক মাতাল হইয়া উঠিলেন। যদি তিনি আগে হইতেই প্রতিজ্ঞা করিতেন যে কখনও মদ খাইব না, তাহা হইলে এমন চাষা কেহই নাই যে তাঁহাকে নিজের প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিযা মদ খাইতে বলিবে, কিন্তু প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষব না করিয়া তাঁহাব প্রাণ গেল। কলিকাতায় যে সাহেবের অধীনে তিনি সরকাবী ডাক্তাবেব কর্ম্ম কবিতেন, একদিন নেশাব ঝোঁকে তাহাব সহিত ভয়ানক চটাচটি কবিলেন, এই সময তাঁহাব কতকগুলি কুসঙ্গী যুটিয়া গিয়াছিল, তাহারা এই আগুণে বাতাস দিতে লাগিল। তাহাদেব পবামর্শে ও নিজের গোঁয়াব বুদ্ধিতে, মন্মথ বাবু কর্ত্তা সাহেবদিগকে বলিয়া চট্টগ্রামেব পাহাড়ে বদলী হইলেন। এই দূবদেশে তাঁহাব আত্মীয় স্বজন কেহই ছিল না, এমন আপনার লোক কেহ ছিল না যে তাঁহাকে একটু অল্প কবে মদ খাইতে বলে। দিন বাত্রি তিনি মদ খাইতেন, অন্য আহাব ছিল না। এইরূপ কবিযা কতদিন চলে? তবুও সেখানকাব বড় সাহেব তাঁহাকে ভাল কবিবাব জন্য বিস্তব চেষ্টা কবিযা-ছিলেন। তিনি সকলকে হুকুম দিলেন—"ডাক্তাব বাবুকে যে মদ দিবে, তাহাব জবিমানা কবিব।" কিন্তু তাঁহাব হুকুমে কোন ফল হইল না। যাহাকে মদেব ভূতে ধরিয়াছে, সে হতভাগাব মত দুঃখী কি আব এ পৃথিবীতে কেউ আছে? মন্মথ বাবু লুকা-ইযা লুকাইয়া মদ খাইতেন। এত অত্যাচার যেন পবমেশ্বব সহিতে পাবিলেন না! এক দিন রক্ত বমি কবিয়া মন্মথ বাবুব প্রাণ বাহিব হইযা গেল।

আমবা সংক্ষেপে তাঁহার জীবনেব কথা বলি লাম। মদ ধবিবাব পূর্ব্বে তিনি কিরূপ দেবতার মত ছিলেন, কিরূপ সচ্চবিত্র, ধার্ম্মিক লোক ছিলেন এবং মদ খাইতে শিখিয়াই বা কিরূপ পিশা-চেব মত হইযা উঠিয়াছিলেন, তাহাব কথা বেশী কবিয়া লিখিতে পাবিলে, পাঠক পাঠিকাগণ বুঝিতে পারিতেন মদে কি সর্ব্বনাশ করে। আমাদেব আর অধিক লিখিবার স্থান নাই। আমাদের দেশে একটী সংস্কৃত কথা আছে, তাহার অর্থ এই—

মদ পান করিবে না, কাহা-কেও দিবেনা, কাহারও নিকট হইতে লইবে না।

এই কথা চিরকাল মনে রাখিও। সাহেবেরা

যাহা করে, তাই যে ভাল, তাহা মনে করিও না সাহেবেরা মদ খায়, বলিয়া কি আমরাও খাইব? থাক, বাপু! এ সভ্যতা। মদখোর সভ্য হওয়ার চেয়ে জলখোর **অসভ্য** হওয়াও ভাল।

আমাদিগের পুরস্কার।

আমরা আগামী বর্ষে নিম্নলিখিতরূপ পুরস্কার দিতে ইচ্ছা করিয়াছি।

১। যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক ধাঁধার উত্তর দিতে পারিবেন, বর্ষশেষে তাঁহাকে একটী পুরস্কার দেওয়া যাইবে। যাঁহারা উত্তর দিবেন তাহাদের বয়স ১২ বৎসরের কম হওয়া আবশ্যক।

২। ১৬ বৎসরের কম বয়স্ক বালক বা বালিকা যিনি সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট চিত্র করিয়া পাঠাইতে পারিবেন, তাঁহাকে একটী বিশেষ পুরস্কার দেওয়া যাইবে। বং এ বা পেন্‌সিলে, যিনি যে কোন বিষয়ে ইচ্ছা চিত্র করিতে পারিবেন। আগামী ৭ই জুনের মধ্যে আমাদের নিকট পৌঁছা আবশ্যক।

৩। আমরা রচনা বিষয়ে তিনটী পুরস্কার দিব;—(ক) ৮ থেকে ১০ বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের বালক বালিকাদিগের জন্য; (খ) ১১ থেকে ১৩ বৎসরের পর্য্যন্ত বয়সের বালক বালিকাদিগের জন্য; এবং (গ) ১৪ থেকে ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের বালক বালিকাদিগের জন্য। প্রত্যেক শ্রেণীর রচনার বিষয় এই:—

(ক) "একটী ছোট ছেলে মাকে বেশী ভালবাসে, না আপনার খেলানাকে বেশী ভালবাসে!" এই বিষয়ে গদ্য রচনা।

(খ) "একটী ছোট মেয়ে মরে গেছে, তার মা তার পাশে বসে দুঃখ করিতেছেন," এই বিষয়ে ৩০ লাইনের মধ্যে একটী পদ্য রচনা।

(গ) "কাক ডাকিতেছে, জলের মধ্যে তালগাছ, ঘোড়া ছুটিয়া গেল, ছোট খুকী কাঁদিয়া উঠিল, বাঘের ভয়, শিয়ালের বাচ্ছা, কি সর্ব্বনাশ! জামা যোড়া, বড়লোক, সাহসী পুরুষ, হৈহৈ শব্দ, শিকারী।" এই কথাগুলি বজায় রাখিয়া এবং ভাব ঠিক রাখিয়া একটী অর্থসংলগ্ন গদ্য রচনা। যত ইচ্ছা নূতন কথা বসাইতে পারিবে, কিন্তু রচনাটী ২০ লাইনের চেয়ে লম্বা হইবে না।

এই রচনাগুলি আগামী ৭ই জুনের মধ্যে আমাদের নিকট পৌঁছা আবশ্যক। প্রত্যেক রচনাতে স্কুলের শিক্ষক বা কোন কর্ত্তা ব্যক্তির স্বাক্ষর চাই, তিনি লিখিয়া দিবেন যে বালক বা বালিকা নিজে এই রচনাটী করিয়াছে।

ধাঁধা॥

গত বারের প্রশ্নগুলির উত্তর।

১। ২৬, ৩০, ১৪, ৫৬।
২। যুতোর ব্যবসায়।
৩। একটীও রহিল না, সবগুলি ভয়ে উড়িয়া গেল।
৪। ১০ মোহর।

নূতন।

১। কোন্ জিনিষ এত হালকি যে কথা কহিলেই ভাঙ্গিয়া যায়?

২। সে কোন্ পুস্তক যাহা চিরকালই নূতন?

৩। হিন্দুর ছেলে ব্যারাম হয়ে পড়েছে; ডাক্তার আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "গরুটী খাবে?" ইহা লইয়া ভয়ানক গোল বাঁধিয়া গেল। রোগী বলিল "আমাকে গরু খাইতে বলিয়াছে।" পাশের একজন লোক বলিল, "না না! তোমাকে গরু বলিয়াছে এবং 'টী' অর্থাৎ চা খাবে, কি না জিজ্ঞাসা করিয়াছে।" ডাক্তার বলিলেন "আমি যা বলিয়াছি, তাতে দুই বুঝা যায়, কিন্তু আমি দুয়ের একটীও বলি নাই; তোমাদের শোনবার বা বোঝবার ভুল।" বলতো কেমন করে ভুল হ'ল!

৪। সে কোন্ খাবার যা খেলে পেটও ভরে না, পয়সাও যায়, আবার সঙ্গে সঙ্গে লোকেও নিন্দা করে?

৫। ভাল করে বাধ মোরে, আমি সবই হই,
আঁচড় দিলে মোর পিঠে আমি কেহ নই।

৬। দুইটী অক্ষর মোর—প্রথম থাকে সঙ্গে,
দ্বিতীয় বলিলে শিশু ধেয়ে যায় রঙ্গে,
সবে ভাল বাসে মোরে, বল দেখি সখা,
কে আমি?—না জান যদি তুমি বড় বোকা।

বিজ্ঞাপন।

আমরা পাঠকপাঠিকাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে সখার মূল্য অগ্রিম দেয়। দুঃখের বিষয় অনেকে এখনও মূল্য প্রদান করেন নাই। আমরা আশা করি যাহারা এখনও মূল্য প্রদান করেন নাই, তাহারা অবিলম্বে দেয় মূল্য প্রদান করিয়া বাধিত করিবেন।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

'সখা' প্রত্যেক ইংরাজী মাসের ৭ দিবসের মধ্যেই বাহির হয়। কিন্তু মুদ্রা যন্ত্রের গোলমালে এই দুই মাস তাহা না হইয়া ৭ দিন পিছাইয়া পড়িতেছে। এ জন্য আমরা বড় লজ্জিত আছি। আমরা আশা করি আগামী মাস হইতে 'সখা' যথা সময়ে সকলকে দেখা দিতে পারিবে। বাঙ্গালার অনেক মাসিক পত্র যেমন যে মাসের কাগজ, তাহার ৪।৫ মাস পরে বাহির হয়, অনেকে মনে করেন, ইহারও সেই দশা হইতেছে। এ সম্বন্ধে আমরা আমাদের গ্রাহক গ্রাহিকাদিগকে বলিতে পারি যে সেরূপ অবস্থা হইলে, 'সখা' আর কাহাকেও আপনার মুখ দেখাইবে না। মূল কথা, পত্রিকাখানির যদি সুবন্দোবস্ত না হয়, তাহা হইলে আমরা উহাকে রাখিতে চাই না। আগামী মাস হইতে এইরূপ সুবন্দোবস্ত হইবে, আমরা আশা করি।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

সখা-সংক্রান্ত নিয়মাবলী।

১। সখার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কলিকাতা ও মফঃস্বলে এক টাকা মাত্র। প্রতি খণ্ডের নগদ মূল্য /১০ মাত্র। পোষ্টাল নোট, মণিঅর্ডার বা অর্দ্ধ আনার ডাকটিকিটে, "সখা কার্য্যাধ্যক্ষ" এই নামে সখার মূল্যাদি পাঠাইতে হইবে। ডাকটিকিটে মূল্য পাঠাইলে প্রত্যেক টাকায় কমিশন বলিয়া /০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

২। পত্রিকাস্থ চিত্রের সংখ্যা কিছুই নির্দ্দিষ্ট থাকিবে না, তবে প্রত্যেক সংখ্যায় যাহাতে অন্ততঃ এক খানি চিত্র থাকে আমরা সেদিকে দৃষ্টি রাখিব।

৩। বালকবালিকাদিগের রচনা উৎকৃষ্ট হইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইবে. তবে সুদীর্ঘ হইলে প্রকাশিত হইবে না।

৪। শিক্ষক এবং অভিভাবকদিগের পরামর্শ প্রভৃতি সাদরে গৃহীত হইবে।

৫। বালক বালিকাদিগের উপকারে আসিতে পারে, কেহ এরূপ কোন রচনা বা কোন সংবাদ কিম্বা সত্য ঘটনার বিশেষ বিবরণ আমাদিগের নিকট পাঠাইলে আমরা তাহা সাদরে প্রকাশ করিব।

৬। সখা-সংক্রান্ত সমস্ত পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে। কেবল রচনা, পরামর্শ প্রভৃতি সম্পাদকের নামে কার্য্যালয়ের ঠিকানায় পাঠান আবশ্যক।

৭। ধাঁধার উত্তর, আলোচনার বিষয়, বা সখায় প্রকাশ করিবার জন্য পত্র প্রভৃতি, পূর্ব্বের মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে আমাদিগের কার্য্যালয়ে পৌঁছা আবশ্যক।

৮। ঠিকানার পরিবর্ত্তন, তিন মাসের কম সময়ের জন্য হইলে, তাহা করা যাইবে না; অল্প সময়ের জন্য হইলে গ্রাহকগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্থানীয় ডাকঘরের সহিত পরিবর্ত্তনের বন্দোবস্ত করিবেন।

"সখা" কার্য্যালয়,
৫০ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট।
কলিকাতা।

শ্রীঅন্নদাচরণ সেন।
"সখা" কার্য্যাধ্যক্ষ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিতএবং ৫০নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, "সখা" কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

দ্বিতীয় ভাগ। এপ্রেল, ১৮৮৪। ৪র্থ সংখ্যা।

ছি দাদা! এমন ঘুম!!

! দাদা! এমন ঘুম!! এই মা ঘুম ভাঙ্গিয়া দিয়া গেলেন, আর অমনি আবার ঘুমাইয়া পড়িলে? এখন ও যে নটা বাজেনি?

অবিনাশের ভ্রুক্ষেপই নাই নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রায় মগ্ন রহিয়াছেন। গিরিবালা দু তিন বার ডাকিয়া বলিতে চেতনা হইল, বড় বিরক্ত ও হইলেন, ছোট বোনটীকে খুব বকিয়া উঠিয়া গিয়া শয্যায় শয়ন করা হইল। গিরিবালা আপন মনে বৈ দেখিয়া অর্থ লিখিতেছিল, ৯টা পর্য্যন্ত লিখিয়া বৈ টৈ গুছাইয়া রাখিল, এবং মার নিকটে গিয়া মার সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া ধীর ভাবে আপনার শয্যায় গিয়া শয়ন করিল। পরদিন প্রত্যূষে উঠিয়া আবার প্রার্থনা করিয়া গিরিবালা পড়িতে বসিল, কিন্তু বেলা ৮ টার সময়ে অবিনাশ চক্ষু রগড়াইতে রগড়াইতে আসিয়া ঘরে কেদারায় ধুপ করিয়া বসিল, এবং খানিক পরে আবার কেদারার উপর মাথা রাখিয়া ঘুমাইতে লাগিল। গিরি বারবার ডাকিল, কিন্তু অবিনাশ তাহা শুনিল না; তখন গিরি অগত্যা মাকে ডাকিয়া আনিব বলিয়া ভয় দেখাইল, তখন মার বকুনির ভয়ে অবিনাশ মুখ ধুইতে গেল, কিন্তু তখন প্রায় বেলা ৯টা. সুতরাং স্কুলে যাইবার সময় হইল, সকলে স্নানের জন্য ব্যস্ত হইল, অবিনাশের আজ আর পড়া তৈয়ার হইল না।

এইরূপ রোজই হয়, কাজেই একদিন ও তাহার পড়া তৈয়ার হয় না। মাষ্টার মহাশয় এত বলেন, বকেন কিছুতেই কিছু হয় না। বালকটীর মুখ দেখিলেই তাহাকে খুব বুদ্ধিমান বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু ঘুম ও অলসতার জন্য তাহার পড়া শুনা কিছুই হয় না। সব ছেলেরা তাহার ঘুমের জন্য তাহাকে তামাসা করে। সে স্কুলে গিয়া ক্লাশে বসিয়াও ঘুমায়!! তাই তাহারা সকলে তাহার নাম রাখিয়াছে "কুম্ভকর্ণ।" এ বৎসর গিরি কত পুরস্কার পাইয়াছে, কত রকম রকম খেলনা, একটা পোষাক, একটা ঘড়ী, আরও কত *জিনিশ!* কিন্তু দাদা তার কোন কাজেই নয়। পারিতোষিক বিতরণের দিন সকলে উঠিয়া গিয়া পুরস্কার লইয়া হাসি মুখে আসিয়া নিজ নিজ স্থানে বসিতেছে, অবিনাশের মনটা বড়ই খারাপ হইল, সে চুপ করিয়া বসিয়া আছে। মনে যে *কি* ক্লেশ হইতেছে তা বরং তোমরা বুঝিয়া লও, আমি লিখিতে পারি না। হঠাৎ মাজিষ্ট্রেট সাহেব, যিনি পারিতোষিক

বিতরণ করিতেছিলেন, তাহাকে ডাকিলেন। আস্তে আস্তে ম্লান মুখে অবিনাশ তাঁহার নিকটে গেল। সাহেব তাহার সুন্দর মুখ দেখিয়া বড় খুসী হইয়াছিলেন,—তাই আশ্চর্য্যও হইয়াছিলেন যে এমন বুদ্ধিমান বালক কেন ভাল পড়ে না? ডাকিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি পারিতোষিক পাইলে না কেন?" একে ত তাহার মনে ঐ ঘোর দুঃখ ছিল, তার পরে সকলের মধ্যে ডাকিয়া যেই সাহেব ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, অমনি অবিনাশ "ভ্যাক্" করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল; কিছুই বলিতে পারিল না। সাহেব কাছে আনিয়া রুমাল দিয়া তাহার চক্ষু মুছাইয়া ভাল বাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলে বড় দুঃখের সহিত বলিল "ঘুমের জন্য।" তিনি তখন দুঃখিত হইয়া তাহাকে একখানি বৈ দিবেন বলিলেন, তাহা মন দিয়া পড়িতে বলিলেন।

সে দিনের দুঃখ, লজ্জা, অপমান, অবিনাশ আর ভুলিল না। সে দিন হইতে সে ঘুম ছাড়াইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু কোনও মতে এই বহুদিনের কুঅভ্যাস ছাড়িতে পারিল না। কিছু দিন এইরূপে যায়, পরে গিরি ও তাহার দুঃখে কাতর হইয়া বলিল "দাদা তুমি অত কষ্ট কর কেন মিছামিছি? পরমেশ্বরের নিকট রোজ প্রার্থনা করিলেই তোমার ঘুম সারিয়া যাইবে।" সে তখন অবধি তাহাই করিতে লাগিল। এমন সময়ে সাহেবের সেই বৈ খানি আসিয়া উপস্থিত হইল। অবিনাশ তাহা আগাগোড়া পড়িল। তখন তাহার মন স্থির হইল, যেন সে কি অমূল্য ধন লাভ করিল; ক্রমে চেষ্টা করিয়া ও ঐ বৈএর কথামত কাজ করিয়া সে এখন ঘুমকে পরাজয় করিয়াছে। অবিনাশ একদিন পারিতোষিক পায় নাই বলিয়া কত কাঁদিয়াছিল, সে আজ খুব ভাল করিয়া বিদ্যা শিক্ষা করিতেছে, ক্লাশে সর্ব্বদাই প্রথম থাকে এবং কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ প্রতি বৎসর ঐ সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যায়।

আমাদের প্রিয় পাঠক পাঠিকাদিগের মধ্যেও হয়ত অনেকে আছেন যাঁহারা অবিনাশের মত বিপদগ্রস্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের উপকারের জন্য সেই বইখানি হইতে গোটাকতক কথা তুলিয়া দিব, তাঁহারা মন দিয়া পড়িয়া প্রার্থনা ও যত্নের সহিত চেষ্টা করিলেই শীঘ্র ঘুমকে বশে আনিতে পারিবেন।

(১) পড়িতে বসিবার সময়ে, যে যে বইগুলি পড়িতে হইবে সে গুলিকে সম্মুখে রাখিয়া মনে মনে কাজটাকে একবার বেশ করিয়া বুঝিয়া লইবে, এবং "সমস্ত করিবই" বলিয়া মনে করিবে।

(২) যে সকল বই বেশ সহজ ও পড়িতে ভাল লাগে সেই গুলিই রাত্রে পড়িবে। অঙ্ক কসাও মন্দ নহে। যাহাতে সহজে ঘুম পায় না এমন বই পড়িবে। একখানা পড়িতে পড়িতে ঘুম পাইলে আর একখানা লইবে ও গা ঝাড়া দিয়া বসিবে।

(৩) মুখে জোয়ান বা লবঙ্গ থাকিলে ভাল হয়। ঠিক সোজা হইয়া বসিবে ও হস্তে বই লইয়া উঁচু করিয়া ধরিবে। পেন্সিল বা আর কিছু লইয়া টেবিলে "ঠক্ ঠক্" শব্দ করিলে ও অনেক সময় ঘুম যায়। ঘুম পাইলে পা দুটী নাড়া দিলেও ভাল হয়। কিন্তু সাবধান! যেন ঘুম তাড়াইতে গিয়া এই অভ্যাস না হইয়া যায়, তা হলে বড় দোষ।

(৪) আহার করিবার পূর্ব্বেই পড়া শেষ করা উচিত। পড়া হইয়া গেলে আহার করিয়া একটু বাহিরে ছাতে টাতে বেড়াইয়া ধীর মনে প্রার্থনা করিয়া বা সৎবিষয়ের কথা কহিয়া, কিম্বা সমস্ত দিন কিরূপে কাটাইয়াছি ও কিরূপে কাটান উচিত, এই সব বিষয় চিন্তা করিয়া পরে শয়ন করা উচিত। খাওয়ার পরেই প্রায় ঘুম পায়,—এ জন্য যদি খাওয়ার পরে পড়িতে হয় তবে যেন এই প্রথম ঘুমের তেজটাতে পরাস্ত না হও, দেখিবে। কোন রকমে এই প্রথম ধাক্কাটী সামলাইতে পারিলে আর ভয় থাকে না। ইহাকে "ভাতঘুম"